ব্যোমকেশ : শরদিন্দু বনাম গণমাধ্যম

অনামিকা দাস

গণমাধ্যমে গোয়েন্দা সাহিত্যের ব্যবহার নতুন নয়। গোয়েন্দা সাহিত্যকে কেন্দ্র করে টলিউড তথা বলিউডে বিভিন্ন সময়ে নানা চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে। তবে গত পাঁচ-ছ বছরে গোয়েন্দা ও থ্রিলার-নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণের যে বান এসেছে, যে-বান ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বিভিন্ন গণমাধ্যমকেও, তার জুড়ি মেলা ভার। আর, গণমাধ্যমের যূপকাষ্ঠে ইদানীংকালে যাঁকে সবচেয়ে বেশি বলি হতে হচ্ছে, তিনি—ব্যোমকেশ বক্সী।

গণমাধ্যম প্রসঙ্গে পরে আসব। তবে তার আগে দেখে নেওয়া দরকার শরদিন্দুর লেখনীতে ব্যোমকেশের আদত গড়নটা ঠিক কীরকম। দরকার এই কারণে, সেই বাসু চ্যাটার্জী থেকে শুরু করে দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত সকলেই ব্যোমকেশ-কাহিনি খুঁটিয়ে না-পড়ে, বা না-পড়তে চেয়ে এক-একরকম ভাবে সেইসব কাহিনির ঘটনাকাল নির্ধারণ করতে চেয়েছেন। সংবাদমাধ্যমও সমর্থন করেছে তাঁদের। তাই বাসু চ্যাটার্জীর ব্যোমকেশরূপী রজিত কাপুরকে ১৯৩২-এ 'সত্যান্বেষী'তে বলতে শোনা যায়, 'ইয়ে মেরা পহেলা কেস হ্যায়'। অন্যদিকে দিবাকর জানান, ১৯৪৩-এর কলকাতায় তাঁর ব্যোমকেশ সুশান্ত সিং রাজপুত যে-কেসটা সমাধান করে, 'সেটাই তার জীবনের প্রথম কেস'। গণমাধ্যমে গবেষণার জাঁতাকলে পড়ে ব্যোমকেশ কখনও ১৯০২-এ জন্মায়[১]। কখনও ১৯০৩-এ।[২] আবার কখনো-বা তার জন্ম হয় ১৯২০-২১ নাগাদ।[৩]

আমাদের আধুনিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যেভাবে মিডিয়া-বেষ্টিত, তাতে এইসব দেখেশুনে কেউ ভাবতেই পারেন, ব্যোমকেশের জন্ম-সনের কি তবে কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই! তাই, ব্যোমকেশের মৌল গড়নটা সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার।

ব্যোমকেশকে নিয়ে শরদিন্দু মোট তেত্রিশটি কাহিনি লিখেছিলেন—শেষেরটি যদিও অসমাপ্ত। ব্যোমকেশের কাহিনিগুলির নিবিষ্ট পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন, ব্যোমকেশের জীবনে সেগুলো কাহিনি হিসেবে আসেনি। এসেছিল কেস হিসেবে। পরবর্তীকালে অজিত ও সর্বজ্ঞ কথক শরদিন্দু সেগুলোর কাহিনিরূপ দিয়েছিলেন। শুধু

তাই নয়, ব্যোমকেশের জীবনে কেসের সংখ্যা, কাহিনি-সংখ্যার সমান নয়। অর্থাৎ কেস সংখ্যা তেত্রিশ নয়। তাহলে কত? একচল্লিশ। কারণ, অজিতের লেখনীতে ব্যোমকেশের এমন কিছু কেসের নামোল্লেখটুকু পাওয়া যায়—যে-কেসগুলো পরবর্তীকালে অজিতের লিখনে আর রূপ পায়নি। যেমন সত্যান্বেষী জীবনের প্রথম পর্বে 'মাকড়সার রস' কাহিনিতে উল্লিখিত এক জালিয়াতির কেস কিংবা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ডাকে ১৯৪৭-এর জানুয়ারি থেকে জুলাই—এই সাত মাস ধরে ব্যোমকেশকে দিল্লিতে ব্যস্ত-রাখা কোনো এক গোপন কেস, সেই সমস্ত ধরেই কেসসংখ্যা মোট একচল্লিশ।

ব্যোমকেশ-কাহিনিগুলিকে যদি লিখনকালের পরিবর্তে ওই একচল্লিশটি কেস সংঘটনের ক্রমানুসারে সাজানো যায়, তাহলে ব্যোমকেশের একটি জীবনপঞ্জি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর সেই জীবনপঞ্জি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ব্যোমকেশের ব্যক্তিগত ও সত্যান্বেষী জীবন পাঁচটি পর্বে বিভক্ত। প্রতিটি জীবনপর্বের সূচনা ও সমাপ্তিতে বিধৃত হয়ে আছে ব্যোমকেশের জীবনের এক-একটি মোড়-ঘোরানো বিন্দু বা turning point। কীরকম?

ব্যোমকেশের জীবনের প্রথম পর্বের কালবিন্যাস ১৯০৪ থেকে ১৯২৪। ১৯০৪-এর ১৩ জুলাই[৪] ব্যোমকেশের জন্ম। আর বহরমপুর কলেজের স্নাতকপর্ব শেষে[৫] কলকাতার হ্যারিসন রোডে ব্যোমকেশ থিতু হচ্ছে ১৯২৪-এ।[৬] ব্যোমকেশের জন্মকালে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সেই আবহে ব্যোমকেশের ছোটো থেকে বড়ো হয়ে ওঠা, তার পরিবার-পরিজন, ইন্টারমিডিয়েটে ছাত্র-থাকাকালীন সত্যান্বেষণে ব্যোমকেশের হাতেখড়ি, বয়ঃসন্ধিকালে বাবা-মায়ের মৃত্যু এবং তারপর স্কলারশিপের টাকায় ব্যোমকেশের পড়াশুনো চালিয়ে যাওয়া—এইসব নিয়েই ব্যোমকেশের জীবনের প্রথম পর্ব।

ব্যোমকেশের দ্বিতীয় জীবনপর্বের সূচনা ১৯২৫-এ। ১৯২৫ সাল ব্যোমকেশের জীবন দু'দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এক, কলকাতায় তার সত্যান্বেষণ শুরু হচ্ছে ১৯২৫[৭] থেকেই। আর দুই, ওই অশ্বিনী মার্ডার কেসের সূত্রেই অজিতের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে ব্যোমকেশের—যে-আলাপ ক্রমশ গড়িয়ে যাচ্ছে বন্ধুত্বে এবং মনের টানেই দুই বন্ধুর একত্রবাস শুরু হচ্ছে। ব্যোমকেশ-অজিতের সেই বন্ধুত্বে একটু অন্যরকম হাওয়া এসে লাগে ১৯৩৩-এ।[৮] কারণ, করালীচরণ বসু মার্ডার কেসের সমাধান করতে গিয়ে সেই কেসের প্রধান সন্দেহভাজন সুকুমারের বোন সত্যবতীর প্রেমে পড়ে ব্যোমকেশ। তাই ১৯৩৩-এ যেমন ব্যোমকেশের জীবন এক অন্য মাত্রা পায়, তেমনি তার ওই প্রেমে পড়ার খবর, অজিতের কাছেও হয়ে ওঠে নিঃসন্দেহে এক ধাক্কা। কারণ, আট বছর যে-বন্ধুর সঙ্গে ওঠা-বসা, যাকে মনে হয়েছে একান্তভাবে জেনেছি—সে-ও তবে প্রেমের

ফাঁদে ধরা দেয়? শুধু সখ্যেই নয়, মধুর-এও যে ব্যোমকেশের অভিরুচি, অজিতের কাছে একপ্রকার 'উন্মোচন'-ই বটে!

ব্যোমকেশের জীবনের তৃতীয় পর্বের কালসীমা ১৯৩৩ থেকে ১৯৪০। ব্যোমকেশ এই সময়ের মধ্যে সত্যবতীর সঙ্গে তিন বছরের কোর্টশিপ সেরে ১৯৩৬-এ বিয়ে[৯] করেছে। বিয়ের পর স্বাভাবিক নিয়মেই হ্যারিসন রোডের বাড়িতে পাকাপাকিভাবে চলে আসছে সত্যবতী। অজিত সেইসময় অন্যত্র বাড়িভাড়া করে চলে যেতে চেয়েছিল। আসলে স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞানেই তার মনে হয়েছিল, 'নবদম্পতির জীবন নির্বিঘ্ন করা বন্ধুর কাজ'। কিন্তু ব্যোমকেশ-সত্যবতী তাকে কাছ ছাড়া করে না। ফলে তাদের সঙ্গে এক বাড়িতেই থেকে যায় অজিত। বিয়ের আগে ব্যোমকেশ-অজিত দু'জনে একই ঘরে পাশাপাশি দুটো খাটে শুত। এমনকি জটিল কোনো কেসের তদন্ত চলাকালীন রাতে ঘুম ভেঙে অজিত মাঝে মাঝে অনুভব করত অন্ধকার ঘরে ব্যোমকেশের পায়চারি। ঠিক যেমনটা হয়েছিল সীমন্ত হিরে কেসে। অজিতের বয়ানে ব্যোমকেশের সেই নৈশযাপনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলাম আমরাও। কিন্তু সত্যবতী আসার পর ব্যোমকেশদের 'ব্যাচেলর এস্টাবলিশমেন্ট'-এর চরিত্র বদলের মতো সেই অভ্যাসেরও পট পরিবর্তন। স্বাভাবিক নিয়মেই ব্যোমকেশের নৈশযাপন থেকে সরে যেতে হয়েছে অজিতকে। ফলে তারপর থেকে কোনো কেসের তদন্ত চলাকালীন শুরু থেকে শেষ অবধি সত্যবতী সঙ্গে থাকলে সেই কেসের চিন্তায় ডুবে-থাকা ব্যোমকেশের নৈশযাপনটুকু এরপর থেকে ফাঁকাই থেকে যায়। এই পর্বের ছেদ টানা হয়েছে ১৯৪০-এ।[১০] কারণ সেই বছরই ব্যোমকেশের খোকার জন্ম। আর তারপর থেকেই সদ্যোজাত ছেলেকে নিয়ে ঘোরতর সংসারী ব্যোমকেশের জীবনের চতুর্থ পর্বের সূচনা। এই চতুর্থ পর্বের সূচনাপর্বের সূচনা ১৯৪১-এ এবং পরিসমাপ্তি ১৯৪৮-এ।

ব্যোমকেশের জীবনের অন্তিম পর্বের বিস্তার ১৯৪৯ থেকে ১৯৭০। এই শেষ পর্বে ব্যোমকেশ উত্তর কলকাতা ছেড়ে কেয়াতলায় বাড়ি করে সপরিবারে চলে যায় ঠিকই। ১৯৬৪ থেকে[১১] তার কেসগুলো নিয়ে গল্পরচনার 'অবৈতনিক দায়িত্ব' থেকে অজিতকে সরিয়ে সেই শূন্যস্থান পূরণ করেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, তাও মিথ্যে নয়। কিন্তু এই পর্বে ব্যোমকেশ যে-কেসগুলোর সমাধান করে, সেগুলিতে ব্যক্তি ব্যোমকেশের ডিটেলিং আগের চারটি পর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। সেদিক থেকে ১৯৪৮-এ[১২] সত্যকাম দাস মার্ডার কেসকে এক অর্থে তার জীবনের শেষ গুরুত্বপূর্ণ কেস বলা যায়। তাই চতুর্থ পর্ব ১৯৪৮-এ শেষ করে ঘটনাকাল অনুযায়ী তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ কেসগুলোকে একত্রিত করা যায় অন্তিম পর্বে, মানেক মেহতা মার্ডার কেসে যার সূচনা আর বিশুপাল বধে যার পরিসমাপ্তি।

আগেই বলেছি, ব্যোমকেশের এই কালানুক্রমিক জীবনরেখাটি আমার স্বকপোলকল্পনা নয়। ব্যোমকেশে-কাহিনিতে এটি স্রষ্টা শরদিন্দুর অভিপ্রেত সত্য। এবার স্রষ্টার সেই সৃষ্টিকে গণমাধ্যম কীভাবে ব্যবহার করল, খোদার ওপর খোদকারিতে অনুসরণ করল পাশ্চাত্যকে, সেইটে এবার দেখে নেওয়া যাক।

জন্মের একশো একষট্টি বছর পার করে আজও শার্লক হোমসকে নিয়ে পৃথিবী জুড়ে উন্মাদনার শেষ নেই। তাঁর বিবর্তন ঘটেছে অনেকবার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হোমসকে একবার আধুনিক করা হয়েছিল। কয়েকবছর আগে মেনস্ট্রিম হলিউডে রবার্ট ডাউনি জুনিয়রের চেহারায় তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে ম্যাডোনার প্রাক্তন স্বামী গাই রিচির হাত ধরে। তারপর আমেরিকায় এক টিভি সিরিজে নিউ ইয়র্কে আস্তানা বাঁধা হোমসের সহকারী হিসেবে আবির্ভূত হলেন জন নয়—জোন ওয়াটসন। পুরুষ নন, ইনি মহিলা। তবে, এসব কিছুকেই ছাপিয়ে গেল বিবিসি-র সংস্করণ। বছর পাঁচেক আগে শুরু হয় টিভি সিরিজ 'শার্লক'। প্রথম থেকেই তার টি.আর.পি তুঙ্গে।

বিবিসি-র শার্লক অতি আধুনিক। যুগোপযোগী। তাঁর হাতে কখনও ব্ল্যাকবেরি, কখনও আই ফোন। আছে ল্যাপটপ, ব্যবহার করেন জিপিএস। আর মূল সৃষ্টির সঙ্গে এই সিরিজের সবচেয়ে বড়ো তফাত, এখানে কিংবদন্তী ডিটেকটিভকে আঁকা হয়েছে যৌনতার তুলির টানে। তাই এই শার্লকের ট্যাগলাইন, 'ব্রেনি ইজ দ্য নিউ সেক্সি!' ব্রেনি আর সেক্সি সেই মোহনার নাম বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচ। কোনান ডয়েলের বর্ণনায় যিনি ছিলেন রুগ্‌ণ, প্রায় মধ্যবয়স্ক এবং সেক্স থেকে সাতশো হাত দূরে, বিবিসি-র সিরিজে সেই শার্লক হোমস হয়ে দাঁড়িয়েছেন মূর্তিমান সেক্স আইকন। আর, এই শার্লকোত্তর বেনেডিক্টই জেন ওয়াই-এর অন্যতম হার্টথ্রব। নমুনা—তাঁর নামে তৈরি শ'খানেক ফেক টুইটার প্রোফাইল, ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে তাঁর উদ্দেশে আছড়ে পড়া কোটি কোটি ভক্তের আকুতি, এমনকি তাঁকে ঘিরে ভক্তদের তৈরি নিজস্ব অণুবিশ্বে তাঁর নামের সঙ্গে মিল রেখে পরস্পরকে 'কাম্বারবিচ' বলে সম্বোধন।[১৩]

এককথায়, শার্লক হোমসের বিবিসি সংস্করণ দেখিয়ে দিল, জনপ্রিয়তাকে কীভাবে মূল্যায়নের মাপকাঠি করতে হয় এবং মূল সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়েই বাকি সমস্ত বিকল্প সম্ভাবনার সমূল বিনাশে কীভাবে সমালোচনার সেই মানদণ্ডটিই তার একছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে পারে।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ভারতে আটষট্টিটা বছর কেটে গেল। অথচ, আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে পাশ্চাত্যের যুক্তিবোধ সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে না পারলেও থেমে থাকেনি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ। পাশ্চাত্যে যদি ডিটেকটিভ শার্লক হোমসে-রই

বদল ঘটে যেতে পারে বিবিসি-র নতুন সিরিজে, তাহলে আমাদের দেশই-বা 'পিছিয়ে' থাকবে কেন?

বাংলা গোয়েন্দা-সাহিত্যে ব্যোমকেশের পর উল্লেখযোগ্য হলেন ফেলুদা। কিন্তু ফেলুদায় তো 'টেকনিক্যাল' কারণে হাত দেওয়া যাবে না! কাজেই অবশিষ্ট থাকেন ব্যোমকেশ। অগত্যা ব্যোমকেশের ধ্রুপদী ডৌল বদলে তাকে নতুন প্রজন্মের কাছে নব নব রূপে হাজির করতে বদ্ধপরিকর হলেন সবাই। তাই গত ছ'বছরে দেশ জুড়ে ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া-আন্ত্রিকের মতোই সকলে ব্যোমকেশ-ম্যানিয়ায় আক্রান্ত। টালি-নালার পার থেকে আরব সাগরের ধার অবধি—যে যেখানে পেরেছে, ব্যোমকেশের কাহিনিকে ব্যবহার করেছে। এমনকি টিভি খুললেও রেহাই নেই। সেখানেও হপ্তায় তিন রাত্তির ব্যোমকেশ সিরিজের পাশাপাশি নতুন রিয়্যালিটি শো 'ডিটেকটিভ 2015।

১৯৬৭ তে সত্যজিৎ রায় যখন 'চিড়িয়াখানা' ছবিতে ব্যোমকেশের প্রথম চলচ্চিত্রায়ণ ঘটান, তখন তাঁর প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর ফেলু মিত্তিরের কেরিয়ারের বয়স সবে দুই। সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ সম্পর্কে সত্যজিতের নিজের কতটা ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল জানা নেই। তবে, 'চিড়িয়াখানা' ছবিটা তিনি যে খুব একটা ভালোবেসে করেননি, বরং দায়ে পড়েই কাজটা করতে হয়েছিল, সেটা তিনি সুযোগ পেলেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। ১৯৬৮ তে এই ছবির জন্য সেরা পরিচালকের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাওয়ার পর মারি সিটনকে লেখা চিঠিতে তাঁর বিস্ময়ের বহিঃপ্রকাশেই সেটা স্পষ্ট। আসলে, কে খুনি, বা whodunit গোছের থ্রিলারে শেষ দৃশ্যে নিয়ম করে সবাইকে বসিয়ে কী করে কী হল, তার খুঁটিনাটি বোঝাতে হয় যেটা সত্যজিৎ-ঘরানার সঙ্গে একেবারেই মেলে না।

সত্যজিৎ-এর 'বোম্বেইয়ের বোম্বেটে'তে লালমোহনবাবুর পাড়াতুতো ভাই বলিউডের হিট পরিচালক পুলকবাবু ফেলুদাকে দেখেই বলেছিলেন, 'আরে মশাই, আপনার মতো হিরো চোখের সামনে থাকতে, আমরা হিরো খুঁজে মরছি!' অর্থাৎ, সত্যজিৎ নিজেই মনে করতেন, ঠিক প্রখর রুদ্র-র মতো না হলেও, ফেলুদা-র ইমেজে বলিউডের নায়ক হওয়ার যথেষ্ট উপাদান মজুত।[১৪]

কিন্তু ব্যোমকেশকে দেখে কেউ নায়ক বলতে পারবে না। 'পথের কাঁটা'র শুরুতেই অজিত লিখছে, 'বাহির হইতে তাহাকে দেখিয়া একবারও মনে হয় না যে, তাহার মধ্যে অসামান্য কিছু আছে।' হ্যাঁ, 'তার গায়ের রং ফরসা, বেশ সুশ্রী সুগঠিত চেহারা—মুখে চোখে বুদ্ধির একটা ছাপ আছে।' কিন্তু দশটা বাঙালির ভিড়ে সে ফেলুদার মতো আলাদা করে চোখে পড়বে না। আর, এটাই ব্যোমকেশের বাঙালিয়ানা।

এহেন বাঙালি ব্যোমকেশকে জ্যান্ত করে তুলতে গেলে তথ্যগত পুনর্গঠনের পাশাপাশি কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। তথ্য যে সমস্ত ক্ষেত্রে চরিত্রকে ছুঁতে পারে না,

একমাত্র যুক্তিসংগত কল্পনাই পারে সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে। তথ্য ও কল্পনার পাশাপাশি চরিত্রটিকে জ্যান্ত রাখা, যে আসলে কোনোদিন ছিলই না, সে বাস্তবে কোনো একদিন ছিল, আগাগোড়া সেই প্রতীয়মানতাকে সুনিশ্চিত রাখা বড়ো সহজ ব্যাপার নয়, তথ্য সংগ্রহের কৌতূহলের পাশাপাশি পরিচালকের অসামান্য শিল্পীসত্তা ছাড়া সেই কাজ অসম্ভব। কারণ, ব্যোমকেশের জীবন তো শুধু ব্যক্তি বা সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের জীবনবৃত্তান্ত নয়। সেই বৃত্তান্তকে ঘিরে থাকা তৎকালীন অপরাধ জগৎ এবং সেই অপরাধ জগতের ওপর ঝোঁক-দেওয়া সমকালীন সমাজের ইতিবৃত্তও বটে। সেদিক থেকে দেখলে ব্যোমকেশের বেশিরভাগ গল্পই এক-একটা পিরিয়ড পিস। শরদিন্দুর ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি, ব্যোমকেশের কাহিনিগুলো সেই প্রচলিত অর্থে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নয় বটে—কিন্তু বৃহৎ অর্থে সেগুলোকেও কি ঐতিহাসিক বলা যায় না? ব্যোমকেশ-কাহিনির সঙ্গে সেই ইতিহাস অনেকক্ষেত্রে এতটাই সম্পৃক্ত যে, টেক্সট-নির্দিষ্ট সময়-পটভূমি থেকে সরিয়ে অন্য সময়-পটভূমিতে নিয়ে গেলে কাহিনির চূড়ান্ত অভিঘাতটিকে হত্যা করা হয়। ঠিক যেমনটা করেছেন বাসু চ্যাটার্জী থেকে শুরু করে অঞ্জন দত্ত, ঋতুপর্ণ ঘোষ থেকে শুরু করে শৈবাল মিত্র হয়ে সদ্য দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

'ব্যোমকেশ পৃথিবীর একমাত্র গোয়েন্দা'—এই ভুল তথ্যকে সত্য জেনে ২০১০-এ অঞ্জন মনে করলেন, সত্যান্বেষী ব্যোমকেশকে নিয়ে ছবি করার 'ম্যাচিওরিটি' এসেছে। তিনি নির্বাচন করলেন শরদিন্দুর 'আদিম রিপু' কাহিনিকে। কারণ, ওই গল্পের প্রেক্ষাপটটা নাকি তাঁকে খুব 'টানে'। 'আদিম রিপু'র সময়কাল ১৯৪৬-এর ২৪ অক্টোবর থেকে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট।[১৫] কিন্তু অঞ্জন তাঁর সিনেমার ঘটনাকাল স্থির করলেন '৬০-এর দশকে। অত্যন্ত 'সৎ' ভাবে জানিয়ে দিলেন, 'ব্যোমকেশের বিয়ের আগের সময়টাকে আমি ঠিকমতো তৈরি করতে পারব না। ফরটিজটা খুব এক্সপেনসিভ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সিক্সটিজটা আমি পারব।' এত বড়ো একটা পরিবর্তনের পরেও পরিচালক 'অতঃপর মনে করলেন, তিনি শরদিন্দুর গল্পটা নাকি 'খুব অল্প' পালটেছেন। শরদিন্দুর ব্যোমকেশ যেমন ছিল, তেমনই নাকি আছে। কারণ, তাঁকে নিয়ে 'অহেতুক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অধিকার' তো তাঁর নেই! কাজেই 'আদিম রিপু' গল্পের পাঠক যখন 'ব্যোমকেশ বক্সী' দেখবেন, তাঁরা বুঝবেন, পরিচালক ব্যোমকেশকে পালটাননি।[১৬] কিন্তু অঞ্জনের 'সততা'য় ভরসা রেকে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে কী দেখা গেল? প্রথমেই পর্দায় ভেসে উঠল, 'এই চলচ্চিত্রে ব্যক্ত সমস্ত মতামতই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্ট চরিত্র অজিতের। কোনোভাবেই তা চলচ্চিত্রের প্রযোজকের /নির্দেশকের নয়।' অর্থাৎ কিনা, স্রষ্টার অভিপ্রায়কেই দর্শকের সামনে হাজির করছেন চিত্র-পরিচালক। আদতে যা তিনি মোটেই করেননি, ছবির

গোড়ায় তাই সাড়ম্বর ঘোষণার এই রাজনৈতিক trick টা অবশ্য অঞ্জনের স্ব-উদ্ভাবিত নয়। ২০০৯-এ চরিত্রাভিনেতাদের অভিনয়-দুর্বলতা ও সামঞ্জস্যহীন সংলাপের কারণে বক্স অফিসে মুখ-থুবড়ে পড়া ব্যোমকেশ কাহিনি 'মগ্নমৈনাক'-এর গোড়াতেও এই একই কথা বলেছিলেন স্বপন ঘোষাল।

যাই হোক, অঞ্জনের ছবির শুরুতেই অজিতের কণ্ঠস্বরে জানা গেল, 'স্বাধীনতার ষোলো বছর পর আবার উত্তপ্ত আমার দেশ, আমার শহর কলকাতা। ৪২-এর মন্বন্তর, '৪৭-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এখন ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে বিবাদের সুযোগ নিয়ে আবার পাড়ায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা।' বোঝা গেল, চল্লিশের কলকাতা দেখানো দুরূহ বলে ১৯৬৩-র ভারত-পাক সীমান্ত-সংঘর্ষজনিত দাঙ্গার কালে ছবিটি স্থিত করেছেন অঞ্জন। (কিন্তু ভারত-পাকিস্তানের সীমান্ত-সংঘর্ষের কারণে ষাটের দশকে কোনো দাঙ্গার কথা তো জানা যায় না! অবশ্য অঞ্জন যখন বলছেন তখন হবেও-বা!) তা, দাঙ্গার নামে অঞ্জন কী দেখালেন? শহরজুড়ে 'ভয়ানক' দাঙ্গা চলছে। কিন্তু দেখে মনে হয় যেন দাঙ্গা-দাঙ্গা খেলা হচ্ছে। সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে অজিত নিশ্চিন্তে বুক ফুলিয়ে কখনো ন্যাপা, কখনো ফজলুর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে, আর তাদের এদিক-ওদিক দিয়ে ধুতি ও লুঙ্গি পরিহিত দাঙ্গাবাজরা ছোরা-তলোয়ার উঁচিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। না, অজিতকে তারা মোটেই মারে না। আসলে মারবে কী করে? সে তো হিরোর বন্ধু![১৭]

অঞ্জন কি কমল হাসানের 'হে রাম' দেখেছেন? কমল আজকের কলকাতাতেই ১৯৪৬-এর সেই বিধ্বংসী দাঙ্গার শুটিং করেছিলেন এবং এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে মেকি বলে মনে হয়নি। অঞ্জন ১৯৬৩-র কলকাতা বলতে দেখিয়েছেন ওই হাস্যকর দাঙ্গা, উত্তর কলকাতার কিছু পুরোনো বাড়ি আর গলি। কিন্তু কোথায় সেই সময়ের ট্রাম? খাদ্য-আন্দোলন? পুলিশের গাড়ি? পিকেটিং-এর অশান্ত কলকাতা?

'আদিম রিপু'তে শিউলি মজুমদার জলসায় গান গাইত। কিন্তু ছবির প্রেক্ষাপটে সেই গান-গাইয়ে অঞ্জন তাকে 'নষ্ট মেয়ে' হিসেবে 'প্রুভ' করতে পারবেন না। এই ছবিতে শিউলি-রূপী স্বস্তিকা তাই একজন বার-সিঙ্গার। আসলে বার-সিঙ্গার না হলে খোলামেলা পোশাকের শিউলিকে আর দেখানো যাবে কী করে? আর তাই-ই যদি দেখানো না যায়, তাহলে অনাদির মতো লোক কেন হঠাৎ শিউলিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, সেটাও দর্শকের কাছে স্পষ্ট করা যাবে না বলে মনে করেছিলেন অঞ্জন। আসলে, অঙ্গ-প্রদর্শন মানেই যে যৌনতা নয়, অভিনেতার আঙ্গিক অভিনয়ের গুণে যথাযথ পোশাকেও যে যৌনতার বিচ্ছুরণ ঘটনো যায়, 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'র দিকে তাকাতে গিয়ে অঞ্জন বা দিবাকর, কেউই সেটা খেয়াল করেননি। বর্তমানের এই free sex বা অবাধ যৌনতার যুগে দাঁড়িয়েও যৌন-বুভুক্ষু বাঙালির জন্যই বোধ হয় সিনেমায়

অমন সিন না রাখলে চলে না। পরিচালকও মনে করেন, যে-কোনো সম্পর্কের পরিণতি যেন-তেন-প্রকারেণ শেষ অবধি বিছানায় টেনে নিয়ে ফেলতেই হবে। তাই শরদিন্দু ননীবালাকে যাবতীয় যৌন ছকের বাইরে রাখলেও অঞ্জন তাকে সেক্স সিম্বল করেই ছেড়েছেন। অঞ্জনের ননীবালা তাই গলা উঁচিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, আমি বুড়োর সঙ্গে সহবাস করেছি। ছেলের ভালোর জন্য ছেলের বাবাকে বশে রাখতে চেয়েছি।' আর, ২০১৪-য় মুক্তিপ্রাপ্ত 'ব্যোমকেশ ফিরে এল'তে মেঘরাজের সঙ্গে পালিয়ে আসা মেদিনীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দর্শকের কাছে স্পষ্ট করতে তাকে পাহাড়গঞ্জের বেশ্যা বানিয়ে গঙ্গাধরের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করিয়েই ছাড়েন নাছোড়বান্দা অঞ্জন। এমনকি খুনি সনতের সঙ্গে মেদিনীর ঘনিষ্ঠতা বোঝাতেও সেই বস্তাপচা বেডসিন-ই অঞ্জনের ধ্যান-জ্ঞান-চিন্তামণি।

বোঝা যায়, এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বুদ্ধিজীবী বাঙালি অনেক ব্যাপারে সাবালক হয়ে উঠলেও তার মানসিক নাবালকত্ব আজও ঘোচেনি। তাই দর্শক টানতে স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে যৌন-হাহাকার প্রদর্শনের রাজনীতি-ই একমাত্র সম্বল।

আসলে কোনো 'পিরিয়ড পিস' নিয়ে গণমাধ্যমে ব্যবসা করতে গেলে তিনটি ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক ডিটেলিং, দুই, পিরিয়ড পিসের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্মাণ, এবং তিন, চরিত্রের যথাযথ চরিত্রায়ণ। আর ঠিক সেটাই ঘটেছে ব্যোমকেশের ক্ষেত্রে।

প্রথমে আসি ডিটেলিং প্রসঙ্গে। শরদিন্দুর 'পথের কাঁটা'র ঘটনাকাল ১৯২৯।[১৮] কাহিনির বিবরণ অনুসারে সেই বছর ১০ মার্চ ছিল রবিবার। বাসু চ্যাটার্জী তাঁর **'Raste ke kanta'**-য় কাহিনির সেই বিবরণ মেলাতে গিয়ে একটি দৃশ্যে ক্যালেন্ডারের পাতায় দর্শককে দেখালেন, সেই বছর ৭ মার্চ ছিল বৃহস্পতিবার। ঠিকই তো! ১০ মার্চ রবিবার হলে ৭ মার্চ বৃহস্পতিবার-ই হওয়ার কথা। বাসুবাবু তো ঠিকই করেছেন। কিন্তু **'Rasta ka kanta'** শুরুর আগেই যে পরিচালক দেখিয়ে দিয়েছেন, তাঁর কাহিনি ১৯৩৩ সালের! আর পাঁজি বলছে, ১৯৩৩-এর ৭ মার্চ বৃহস্পতিবার ছিল না। ছিল মঙ্গলবার![১৯] তাহলে? তাহলে আর কিছুই নয়। ডিটেলিং-এর ক্ষেত্রে প্রথমেই মূল টেক্সট থেকে বিচ্যুত হয়ে তারপর মাঝপথে আবার তাকে অনুসরণ করে সাধারণ দর্শকের মন ভোলানোর এই যে প্রয়াস—একেই আমি বলছি 'রাজনীতি'। 'সত্য'র মোড়কে 'অর্ধসত্য' পরিবেশন, যা কিনা মিথ্যের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

ঠিক একই কাণ্ড অঞ্জনও কি করেননি 'আবার ব্যোমকেশ'-এ? যেহেতু পরিচালকের কথায়[২০] 'আবার ব্যোমকেশ'কে 'ব্যোমকেশ বক্সী'-রই **'continuation'** ধরতে হবে, কাজেই মূলানুগভাবে ১৯৩৯[২১] তো দূর-অস্ত্, সেই ১৯৬৩ তেই ঘটনাকাল স্থির হয় 'চিত্রচোর' অবলম্বনে নির্মিত 'আবার ব্যোমকেশ'-এর। শুরুতেই অজিতের কণ্ঠস্বর

আমাদের বলে দেয়, ডাক্তারের পরামর্শে এপ্রিলের গোড়ার দিকে খোকাকে তার মামার বাড়ি পাটনায় পাঠিয়ে তারা উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সে সামসিং নামক এক জায়গায় হাওয়া-বদলের জন্য বেড়াতে এসেছে। অথচ একদিকে ছবির সাড়ে বারো মিনিটেই অমরেশ রাহা জানান, 'সামনে বড়োদিন আসছে', অন্যদিকে ছবির শেষে এসে ব্যোমকেশ বলে, 'আজ তো ২৯ ডিসেম্বর'। সঙ্গে তাল মিলিয়ে অজিতের voice-over-ও জানিয়ে দেয়, 'ঠিক দু'হপ্তা আগে যখন ডুয়ার্সে এসেছিলাম, তখন ব্যোমকেশের শরীর ছিল আমাদের একমাত্র চিন্তা কারণ।' এপ্রিল থেকে দু'হপ্তা পরে ঠিক কোন্ টাইম মেশিনে চড়ে যে ব্যোমকেশ-অজিতসহ সিনেমার সব চরিত্র ডিসেম্বরের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছায়, এই বাজারে সে রহস্য ফাঁসের ক্ষমতা অঞ্জনের নেই। তাই জানিয়ে রাখা ভালো, অঞ্জন ছবিতে ডিসেম্বরের প্রসঙ্গ এনেছেন শরদিন্দুর 'চিত্রচোর' কাহিনির অন্তিম অংশের সঙ্গে মিল রাখতে। কিন্তু এত বড়ো কাণ্ডটা অঞ্জন অজ্ঞানোচিতভাবে ঘটিয়ে ফেলেছেন, একথা বলার ধৃষ্টতা, আর যাই হোক, আমার নেই। কারণ আমি অঞ্জন দত্তর মতো ফিল্ম-বোদ্ধা নই। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, অঞ্জন সজ্ঞানে এটা করলেন কেন? কী এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য?

এককথায় বলতে গেলে, 'বাজার ধরা'। অঞ্জন দত্তর 'ব্যোমকেশ' রিলিজের আগে-পরে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে অঞ্জন-উবাচ এবং সঞ্চালক তথা সাংবাদিকের গদ্‌গদ্ ভঙ্গিতে তাঁর সমর্থনের ভঙ্গিগুলি নিশ্চয়ই আপনাদের নজর এড়ায়নি! অঞ্জন বলেছিলেন, 'আমার মতে লেখকই সর্বাগ্রে। আমি নিজের মতো করে জিনিসটা ভাবতে পারি। কিন্তু লেখক নিজে কী ভেবেছিলেন, কীভাবে ভেবেছিলেন, সেটা মাথায় রাখতেই হবে। এই জিনিসটা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আ পিরিয়ড ইজ আ পিরিয়ড। সেজন্যেই আমি ব্যোমকেশ বক্সীকে কখনও এই সময়ে আনার কথা ভাবিনি। শরদিন্দু তাঁর লেখায় যে পিরিয়ডটা ধরেছেন, আমি খুব বিশ্বস্তভাবে সেই সময়টাকে ধরতে চেয়েছি।'[২২]

এই সিনেমায় 'টাইম' পত্রিকায় জন এফ কেনেডি-র ছবি আর উত্তমকুমারের 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এর পোস্টার দেখানো হয়। সময়টা তাহলে ১৯৫৯-৬০'।[২৩] কিন্তু তাই-বা হয় কী করে? ছবির ভিলেন অমরেশ রাহা, অঞ্জনের চিত্রনাট্যের 'গুণে' 'ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া'র নাগরাকোটা ব্রাঞ্চের ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হয়েছে ১৯৬৯ সালে। তাহলে, যে-১৯৬৩তে অঞ্জন তাঁর 'আবার ব্যোমকেশ-'এর ঘটনাকাল স্থির করেছেন, সেই ১৯৬৩তে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক সরকারি তকমা পায় কী করে?[২৪] আজও কি এর কোনো উত্তর দিতে পারবেন অঞ্জন?

১৯৩২-এর নভেম্বর সংঘটিত [২৫] সীমন্ত হীরের কেস বাসু চ্যাটার্জীর হাতে পড়ে হয়েছে ১৯৩৪। 'সীমন্ত হীরা' গল্পের সঙ্গে পরিচিত সকলেই জানেন, সেই কেসে

প্লাস্টার কাস্টিং নিয়ে পড়াশুনো করতে অজিতকে নিয়ে ব্যোমকেশ গিয়েছিল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, মানে আজকের ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। বাসু চ্যাটার্জী তাঁর 'Seemnt Heera'-য় ইম্পিরায়াল লাইব্রেরির অবস্থান দেখিয়েছেন আলিপুরে। অথচ, তথ্য বলছে ১৯২৩ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির ঠিকানা ছিল পাঁচ নম্বর এসপ্ল্যানেড ইস্ট। দ্য ফরেন মিলিটারি সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর একটা অংশ জুড়ে ছিল সেই লাইব্রেরি।[২৬] কাজেই, ১৯৩২ হোক, বা ১৯৩৪—কোনো সময়েই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির অবস্থান যে আজকের আলিপুর হতেই পারে না, তা বলাই বাহুল্য। আসলে চল্লিশ মিনিটের প্যাকেজে দৈর্ঘ্য-নির্বিশেষে ব্যোমকেশের এক-একটা কাহিনিকে 'সর্বভারতীয়' করে তুলতে গেলে বাসু চ্যাটার্জীর কথাতেই, 'ওরকম একটু-আধটু বাদ দিতেই হয়'। তাইতো তাঁর 'Upsanhaar' কাহিনির ঘটনাকাল স্থিত হয় ১৯৪৫-এ, আদত ঘটনাকালের বারো বছর পর।[২৭] শরদিন্দুর 'উপসংহার'-এ অনুকূলবাবুর প্রশ্নের উত্তরে অজিত জানিয়েছিল, ব্যোমকেশের মেসে সে আছে 'বছর আষ্টেক।' বাসুবাবুর অজিতের কথনে সেই 'আট' হয়েছে 'দশ বছর'। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, এই বাসু চ্যাটার্জী-ই 'সত্যান্বেষী'র সময়কাল ১৯৩২-এ স্থির করে দেখিয়েছিলেন, সেই সময় থেকেই মেস বাড়িতে ব্যোমকেশের সঙ্গে অজিতের একত্রবাস শুরু। অর্থাৎ কিনা, পরিচালক খোদ শরদিন্দুর ডিটেলিং তো মানলেনই না, উপরন্তু নিজের 'কল্পনা'য় গড়ে তোলা ব্যোমকেশ-কাহিনির ক্রমটিকে নিজেই প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

'চোরাবালি' অবলম্বনে নির্মিত ঋতুপর্ণর 'সত্যান্বেষী'তে আবার ব্যোমকেশ- অজিত মুখে প্রশ্ন করার বদলে নিজেদের মধ্যে কার্ডে সেই প্রশ্নগুলো লেখে। তারপর দু'জনে পরস্পরের প্রশ্নের উত্তর দেয়। ঋতুপর্ণর কারুদক্ষতার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু ঋতুপর্ণ এখানে কী দেখালেন? কার্ডগুলোতে কিনা টাইপ করা প্রশ্ন! টাইপের আধুনিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তো ওঠেই; পাশাপাশি মনে প্রশ্ন জাগে, অজিত-ব্যোমকেশ তখনই ওই ধরনের কার্ড তৈরি করল কী করে? ব্যোমকেশ কি আগে থেকে জেনে-বুঝে, কলকাতা থেকে ওই ধরনের কার্ড তৈরি করিয়ে, তারপর হিমাংশুর বাড়িতে পা রেখেছিল? তাছাড়া, মূল 'চোরাবালি' গল্পে ছিল, কুমার ত্রিদিব একটা চায়ের পেয়ালা নিয়ে তার হাতলে সুতো বেঁধে গাছের ডালে সেটাকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর চামচের আঘাতে শব্দ হতে হিমাংশু সেই শব্দ শুনে লক্ষ্যভেদ করেন। ঋতুপর্ণ হিমাংশুর সেই শব্দভেদী প্যাঁচে আরও প্যাঁচ কষাতে কী করলেন? গাছের ডালে একটা নয়—একেবারে ছ'টা পেয়ালা ঝুলিয়ে দিলেন পরপর। তারপর একটা গাছের ডাল দিয়ে সবকটা পেয়ালাকে একসঙ্গে আঘাত করে শব্দতরঙ্গ তুললেন। পেয়ালাগুলোর পারস্পরিক সংঘর্ষও হল। আশ্চর্যের ব্যাপার এই, শব্দের সেই অনুরণন প্রায় থেমে

যাওয়ার মুহূর্তে, চোখ-বাঁধা অবস্থায় হিমাংশু একের-পর-এক পাঁচটা পেয়ালায় বন্দুক তাক করে গুঁড়িয়ে দিলেন। প্রশ্ন হল, কোনো এক দৈবী ক্ষমতার বশবর্তী হয়ে হিমাংশু যদি ক্ষীণ শব্দ শুনে প্রথম পেয়ালাটিকে বন্দুকের গুলিতে উড়িয়ে দিতে সক্ষমও হন, বাকি পেয়ালাগুলির ক্ষেত্রে তা কী করে সম্ভব? অন্য পেয়ালার সঙ্গে সংঘর্ষের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, তাছাড়া নতুন কোনো আঘাতে ওই পেয়ালাগুলোয় শব্দ তোলা হয়েছিল, এমনও দেখানো হয়নি। তাহলে কোনো শব্দ না শুনেই হিমাংশু কী করে বাকি পেয়ালাগুলির ক্ষেত্রে তাঁর শব্দভেদী প্যাঁচ প্রয়োগ করলেন? ডিটেলিং-এর এই ত্রুটি কি ঋতুপর্ণ ঘোষের সিনেমায় প্রত্যাশিত ছিল? নাকি ধরে নিতে হবে, একবিংশ শতাব্দীতে যে-ঋতুপর্ণ ব্যোমকেশ-কাহিনির প্রথম চলচ্চিত্রায়ণের কথা ভেবেছিলেন, অঞ্জন দত্ত ও স্বপন ঘোষালের একজোড়া ব্যোমকেশের পদার্পণে যে-ঋতুপর্ণ এক মাস তিন দিনের মাথায় নিজের সেই পরিকল্পনা বাতিল করে জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'I feel there's a desperate rush to make a Byomkesh... It has become... competition.',[২৮] অঞ্জনের ব্যোমকেশের ব্যবসায়িক সাফল্য দেখে সেই ঋতুপর্ণর-ও মাথায় ঘুরে গিয়েছিল? তাঁর ছবিতে ডিটেলিং-এর ক্ষেত্রে এত অসাবধানতা, এত অমনোযোগের মূল কি আসলে এই যে, 'সত্যান্বেষী'র সূত্রে ২০১৩-য় নিজেও সেই 'competition'-এ তড়িঘড়ি নাম লেখাতে চেয়েছিলেন ঋতুপর্ণ?

শৈবাল মিত্র পরিচালিত 'শজারুর কাঁটা'য় খুনি প্রবাল গুপ্ত-র আবার 'সমনামবুলিজম' রোগ আছে। তাতে সে প্রত্যেক শুক্রবার রাতে ঘুমের ঘোরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে সুন্দর একটা খাপে করে শজারুর কাঁটাও নিয়ে যায়। আর ঘুমোতে ঘুমোতেই পথের ধারে যাকে পায়, তার পিঠ দিয়ে শজারুর কাঁটা ঢুকিয়ে হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে বের করে দেয়। আর প্রবাল যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও এমন একটা কাজ এত নিখুঁতভাবে করতে পারে, তার কারণ, সে নাকি কবে দু'বছর ডাক্তারি পড়েছিল। ছবির এহেন ডিটেলিং শিরদাঁড়ায় শিহরণ জাগায়। মনে হয়, তাহলে তো ডাক্তারি পড়া এবং তারপর ঘুমিয়ে পড়া খুব সাংঘাতিক ব্যাপার।[২৯]

ব্যোমকেশের প্রথম কেস কোন্‌টা? সেই কেসের সূত্রে কবেই-বা শুরু হয় তার সত্যান্বেষণ? ব্যোমকেশ-কাহিনির নিবিষ্ট পাঠক জানেন, ১৯৩৩-এর জানুয়ারিতে সংঘটিত[৩০] 'উপসংহার' কাহিনির শেষে ব্যোমকেশ বলেছিল, তার সত্যান্বেষী জীবনে যতজন ভয়ংকর শত্রু সে তৈরি করেছে, তার মধ্যে তখনও অবধি তিনজন জীবিত। এক, পেশোয়ারি আমীর খাঁ, দুই, পলিটিক্যাল দালাল কুঞ্জলাল সরকার এবং তিন, কোকেন ব্যবসায়ী অনুকূলবাবু। পেশোয়ারি আমীর খাঁ মেয়ে-চুরির ব্যবসাকে সূক্ষ্ম ললিতকলায় পরিণত করায় বিচারে পিনাল কোডের কয়েক ধারায় তার বারো বছর

জেল হয়। ১৯৩৩-এ দাঁড়িয়ে ব্যোমকেশ হিসেব করে দেখেছে, তখন কেবল অনুকূলবাবুরই জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় হয়েছে। কাজেই সময়ের হিসেব অনুযায়ী, ১৯২১-এ[৩১] আমীর খাঁ কেসেই ব্যোমকেশের সত্যান্বেষণে হাতেখড়ি।

কিন্তু ব্যোমকেশকে 'সর্বভারতীয়' করে তোলার মাতামাতিতে তার জীবনের সেই অন্তর্নিহিত সত্য ঢাকা পড়েছে মিথ্যের আড়ালে। তাইতো বাসু চ্যাটার্জীর ব্যোমকেশ-রূপী রজিত কাপুরকে ১৯৩২-এ 'সত্যান্বেষী'তে বলতে শোনা যায়, 'ইয়ে মেরা পহেলা কেস হ্যায়'। অন্যদিকে দিবাকর জানান[৩২], ১৯৪৩-এর কলকাতায় তাঁর ব্যোমকেশ সুশান্ত সিং রাজপুত যে কেসটা সমাধান করে, সেটাই তার জীবনের প্রথম কেস। অথচ, ওই ছবিতেই প্রথম পরিচয়ে অজিত ব্যোমকেশকে বলে, 'সব জানতা হ্যায় তুমহে'। সেটা যদি ব্যোমকেশের জীবনের প্রথম কেস-ই হবে, তাহলে ব্যোমকেশকে সবাই 'জানতা হ্যায়' কী করে? তাহলে কি ধরে নিতে হবে, পরিচালকের দৃষ্টিতে যে-ব্যোমকেশ তার স্পষ্টবাদিতার কারণে কলেজে 'একঘরে, ঘরকুনো, নিঃসঙ্গ', বিদ্যাসদন কলেজের এক ছাত্র যে-ব্যোমকেশ সম্পর্কে অজিতকে বলে, 'মুহ খোলতা হ্যায় তো মন করতা হ্যায় মুহ তোড় দুঁ সালেকা', সেই ব্যোমকেশ তার রূঢ় সত্যবাদিতার কারণেই কলেজে কুখ্যাত। কিন্তু তাই-ই যদি হয়, তাহলে ব্যোমকেশের সেই কুখ্যাতি শুনেই কি অজিত তার বাবার নিখোঁজ হওয়ার সমাধানের জন্য ছুটে আসে? ছবির ডিটেলিং সেই প্রশ্নে নীরব।

ব্যোমকেশের জন্ম ও সত্যান্বেষণে হাতেখড়ির মতো তার বিয়ে নিয়েও গণমাধ্যমে চাপান-উতোরের শেষ নেই। বাসু চ্যাটার্জীর ব্যোমকেশ সত্যবতীকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে আসে 'Laal Neelam' বা 'রক্তমুখী নীলা' কাহিনিতে। এদিকে ছোটোপর্দায় 'কালার্স বাংলা' চ্যানেলের 'ব্যোমকেশ' ধারাবাহিকে ব্যোমকেশ-সত্যবতীর বিয়ে দেখানো হয় 'উপসংহার'-এ। ওই ধারাবাহিকের 'বিশেষ ১০০ পর্ব'-র মহোৎসব উদ্‌যাপনে [৩৩] বিশেষ অতিথি হিসেবে আগত আবির চ্যাটার্জী জানান, শরদিন্দুর গল্প 'অর্থমনর্থম'-এ নাকি বিয়ে হয়েছিল ব্যোমকেশের। আবিরের সেই 'মহামুল্যবান' বক্তব্যকে সমর্থন করেন আরেক বিশেষ অতিথি সব্যসাচী চক্রবর্তীও। কিন্তু এহেন 'কঠোর' সমালোচনার শেষে কী হয়? না, টেলিভিশন শোয়ের অলিখিত নিয়ম মেনে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'। আবির জানান, 'সবকটা' ব্যোমকেশই ভালো। আর সব্যসাচীও মোটের ওপর তাঁকে সমর্থন জানিয়ে সমালোচনায় ইতি টানেন। কিন্তু যেটা শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন আকারে থেকেই যায় সেটা হল, ব্যোমকেশের বিয়েটা তাহলে ঠিক কবে হয়েছিল?

ব্যোমকেশের যে-জীবনরেখার কথা আগে বলেছি, সেটা অনুসরণ করলে দেখা যাবে, 'অর্থমনর্থম'-এ আদৌ ব্যোমকেশের বিয়ে হয়নি, হয়েছিল পূর্বরাগের সূচনা।

১৯৩৩-এর ২৪ সেপ্টেম্বর, রবিবার, দুর্গাপঞ্চমীর বিকেলে সত্যবতীর প্রেমে পড়ে ব্যোমকেশ।[৩৪] করালীচরণ বসু মার্ডার কেস মিটে যাওয়ার পর ব্যোমকেশ-সত্যবতীর কোর্টশিপ শুরু—যে-কোর্টশিপ তিন বছরের শেষে বিবাহে পরিণতি পায় ১৯৩৬-এ। কাজেই ১৯৩১-এ সংঘটিত 'রক্তমুখী নীলা'[৩৫] বা, ১৯৩৩-এর 'উপসংহার'-এ ব্যোমকেশের বিয়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

সাহিত্য ও চলচ্চিত্র, মাধ্যম হিসেবে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। তাই তাদের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিও যে পৃথক হবে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু 'চিত্রনাট্যের প্রয়োজন' এই তক্‌মা লাগিয়ে ঠিক কতটা স্বাধীনতা নিতে পারেন পরিচালক, আজও কি তার মানদণ্ড নির্ধারণের সময় আসেনি? 'পিরিয়ড পিস' নির্মাণ করতে গিয়ে 'চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে' যেসব পরিবর্তন করা হয়, সেগুলো কি আদৌ পিরিয়ড পিস নির্মাণের সহায়ক?

এযাবৎ মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্জন দত্ত পরিচালিত চারটি ব্যোমকেশ-চলচ্চিত্রেরই ঘটনাকাল ১৯৬০-এর দশক। 'আদিম রিপু'তে উল্লিখিত কালী পুজোকে তাই অগত্যা 'ব্যোমকেশ বক্সী'তে এসে চড়কপুজোয় পর্যবসিত হতে হয়েছে। কিন্তু '৬০-এর দশকে কলকাতায় কোন্ অঞ্চলে চড়ক, অর্থাৎ চৈত্র-সংক্রান্তির দিন বাজি পোড়ানো হত? বিহারের 'লালনিয়া' অঞ্জনের ছবিতে হয়ে দাঁড়িয়েছে 'শুশুনিয়া'। সেই পাহাড়টা কবে বিহারে ছিল?[৩৬]

এই ছবিতে ব্যোমকেশের হাতে একটা 'আবোল-তাবোল' দেখা যায়। 'আবোল-তাবোল'-এর প্রথম সংস্করণ ১৩৩০ বঙ্গাব্দে ইউ রয় অ্যান্ড সন্স থেকে প্রকাশিত হয়েছিল—যা ছাপা হয় মাত্র একশো কপি। এর দু'দশক পর সিগনেট প্রেস 'আবোল-তাবোল'টি প্রকাশ করে। ১৪০৭ বঙ্গাব্দে সুবর্ণরেখা সুকুমার রায়-পরিকল্পিত সেই একশো কপি ছাপা বইটিকে রিপ্রিন্ট করে। তারই একটি ঝকঝকে কপি ওলটাতে দেখা যায় ব্যোমকেশকে। ১৯৬৩ সালে অজিত কী করে সেই কপি কিনে ব্যোমকেশকে উপহার দিয়েছিল, অঞ্জন কি কোনোদিনও তা জানাতে পারবেন? ঠিক যেমন পারবেন না, ব্যোমকেশের হাতে '৮০-র দশকে আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত 'সুকুমার সমগ্র'র দেখা মেলে কীভাবে, সেই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিতে।[৩৭]

হোটেল-মালিক শ্রীকান্তবাবুকে 'হত্যা না আত্মহত্যা' নামের এক রদ্দি ডিটেকটিভ বই পড়তে দেখা যায় এই ছবিতে, যার মলাটই বলে দেয়, সেই বই ১৯৯০-পরবর্তী টেকনোলজিতে ছাপা।[৩৮] তাছাড়া যে-সময় বহু মানুষ দুশো টাকা মাইনে পেতেন কিনা সন্দেহ, সেই-সময় সিনেমার চরিত্ররা কথায় কথায় একশো টাকা, দুশো টাকা বকশিস দেয় কী করে?[৩৯] '৬০-এর দশকে জলপাইগুড়ির বদলে সামসিং-এর মতো এক প্রান্তিক পাহাড়ি গ্রামে জেলাশাসক উমানাথ ঘোষের অফিস। আর, নাগরাকোটা ব্রাঞ্চের ব্যাঙ্ক

ম্যানেজার হলেন অমরেশ রাহা। দু'মাস যমে-মানুষে টানাটানির পর সদ্য অসুস্থতা থেকে সেরে-ওঠা ব্যোমকেশ দু'জায়গাতেই যায়। উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে স্বঘোষিত এক্সপার্ট অঞ্জন কি জানেন, সামসিং আর নাগরাকোটার মধ্যে দূরত্বটা ঠিক কত?[৪০]

অঞ্জনের ব্যোমকেশ-কেন্দ্রিক চারটি ছবিরই ঘটনাকাল ১৯৬০-এর দশক। অথচ ব্যোমকেশ-সহ সমস্ত চরিত্রের কথার লজ্জ আদৌ তা সমর্থন করে না। তাই 'ব্যোমকেশ বক্সী'তে ননীবালা প্রসঙ্গে ব্যোমকেশ কেষ্টবাবুকে জিগেস করে, 'অনাদিবাবুর সঙ্গে ওনার একটা লটরপটর ছিল বলছেন?' উত্তরে কেষ্টবাবু জানান, অনাদি-ননীবাবা ঘরের মধ্যে গিয়ে কী 'ইন্টুমিন্টু' করত, তা তিনি জানেন। 'আবার ব্যোমকেশ'-এর চিত্রনাট্যে ব্যোমকেশের একটা সংলাপ এইরকম, 'শোনো ভাই, আমরা ক্রিকেট খেলার দর্শক। খারাপ লাগলে প্যাঁক দেব, ভালো লাগবে হাততালি দেব'। তবে এদের সব্বাইকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে অঞ্জনের তৃতীয় ব্যোমকেশ 'ব্যোমকেশ ফিরে এল'।

'বেণীসংহার'-এর মূল কাহিনিতে যে-মকরন্দ ঘোড়দৌড়ের মাঠে রেস খেলত, রাজনৈতিক দলাদলিতে থাকত, অঞ্জনের হাতে পড়ে সেই মকরন্দই হয়ে উঠেছে ঘোর কমিউনিস্ট। সে তার পিসেমশাই গঙ্গাধরের সঙ্গে মেদিনীর শারীরিক সম্পর্কের কথা জেনে ফেললে গঙ্গাধর তার মুখ বন্ধ রাখতে টাকার তোড়া ছুঁড়ে দেন। অথচ, ছবির শেষ দৃশ্যে গঙ্গাধর যখন সেই টাকা নেওয়ার জন্য মকরন্দকে দোষারোপ করেন, তখন কমিউনিস্ট মকরন্দ চিৎকার করে বলতে থাকে, 'বেশ করেছি তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি। আমাকে পালিয়ে পালিয়ে বাঁচতে হয়। আমাকে আমার নিজের টাকা নিজের মতো করে জোগাড় করে নিতে হয়। তোমার নোংরামি আমাকে তোমার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। সে সুযোগ ব্যবহার করেছি, বেশ করেছি। শালা ভদ্দরলোক! শালা লম্পট জোচ্চোর বুর্জোয়া শালা!' ষাটের দশকের পিরিয়ড পিস-এ মানুষের লজ্জের এহেন নমুনাপ্রাপ্তিতে বিস্ময়ের ঘোর কাটতে-না-কাটতেই ফের ওই মকরন্দ 'শোনো পিসে, তোমার ওই নোংরা টাকার একটা টাকাও আমি খরচা করিনি। এই নাও তোমার টাকা' —এই-না বলে মুঠো মুঠো সব টাকা পিসে গঙ্গাধরের দিকে ছুঁড়ে দেয়। পিরিয়ড বানানোর নামে মকরন্দর মতো এইরকম অসংগতিপূর্ণ চরিত্র উপস্থিতির মানে কী? কমিউনিস্ট আদর্শবাদী মকরন্দ-বাচনের পাশে পাহাড়গঞ্জের বেশ্যা মেদিনীর মুখে চিত্রনাট্যকার তথা পরিচালক অঞ্জন আবার বসিয়ে দেন 'নিকৃষ্ট'র মতো তৎসম শব্দ।

ঋতুপর্ণর 'সত্যান্বেষী' আবার এমন এক সময়ের 'পিরিয়ড পিস' যখন কলকাতায় নাকি শেয়াল ডাকত। সে না হয় বোঝা গেল। কিন্তু সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে দাঁড়িয়ে ব্যোমকেশ-অজিত-হিমাংশু-অলকা সকলেই কেন মুড়িমুড়কির মতো হালফ্যাশানের

ইংরিজি বলে? 'রিলেশনশিপ কমপ্যাটিবিলিট', 'বেসিক ইন্সটিঙ্কট', 'অ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্ট'-এর মতো শব্দবন্ধ ছড়িয়ে থাকে গোটা সিনেমাটা জুড়ে? শব্দ ব্যবহারের যে একটা ইতিহাস-ভূগোল থাকে, ঋতুপর্ণ ঘোষ সেই বিষয়ে সচেতন নন, এও তবে ভাবতে হল আমাদের! শেষ পর্যায়ে এসে কী হয়েছিল ঋতুপর্ণর? শরীরে দিচ্ছিল না? মানসিকভাবে ক্লান্ত থাকছিলেন? নাকি প্রকৃতির নিয়মেই সৃষ্টিশীলতারও একটা শেষ থাকে এবং ঋতুপর্ণ সেই পর্বটাই স্পর্শ করে ফেলেছিলেন?[৪১]

ঋতুপর্ণ তাঁর 'সত্যান্বেষী'তে বাংলা ও ইংরিজি ভাষায় জগাখিচুড়ি যেখানে শেষ করেছিলেন, ঠিক সেখান থেকেই শুরু করেছেন অঞ্জন দত্ত। ব্যোমকেশ-কেন্দ্রিক অঞ্জনের চতুর্থ সিনেমা 'ব্যোমকেশ বক্সী'র সময়কাল '১৯৬০-এর দশকের শেষদিক'। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে মৃগেন মৌলিক বলেন, 'অরবিন্দ কোথায় ছিল, I really don't know'। মধুময় পালের কণ্ঠে শোনা যায়, 'গোয়েন্দা বন্ধু চোট পেয়েছে বলে you are filling in the gap'। কখনও আবার অরবিন্দ হালদারের বাচনে পরিচালক বসিয়ে দেন এইরকম উক্তি—'প্রাণহরি আমাকে আর ফণীশকে ব্ল্যাকমেল করছিল regarding মোহিনী'। বাংলার প্রতি উন্নাসিক মানসিকতা থেকে বাংলা-ইংরাজির সংমিশ্রণে একবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত এহেন ভাষার নমুনাকে অঞ্জন দত্ত কোন্ আক্কেলে '৬০-এর দশকে এনে ফেললেন?

এদিকে, ব্যোমকেশকে আন্তর্জাতিক দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে-চাওয়া দিবাকর আগেই ঘোষণা করেছিলেন, 'Through this film, I want to depict the kaleidoscopic and adventurous side of Calcutta.'।[৪২] কিন্তু সেই সাড়ম্বর ঘোষণার পর 'ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সী'তে কী দেখানো হল? গাদা গাদা টাকা খরচ করে, প্রচুর স্পেশাল এফেক্ট দিয়ে সিনেমার প্রতিটা ফ্রেমের পেছনে ১৯৪৩-এর কলকাতা শহর টাঙানো আছে। তাতে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মতো এক ঝলক করে সব আছে—ঘোড়ার গাড়ি, পুরোনো ট্রাম, মাথাখোলা দোতলা বাস। শুধু ১৯৪৩-এর প্রেক্ষাপটে ছবি করেও দিবাকরের কলকাতায় কোনো রাজনৈতিক মিছিল নেই। সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ নেই। নেই সেনাব্যারাক। নেই, ১৯৪৩-এর বাংলার সবচেয়ে ভয়াবহ ও প্রধান ঘটনা বিরাট বীভৎস দুর্ভিক্ষ। অনাহার। মন্দা। আসলে মন্বন্তরটা দেখালে, হাজার হাজার বুভুক্ষু ও মরতে-বসা আর মরে পড়ে-থাকা মানুষের সামনে দিবাকরের গোয়েন্দা কি আর লম্ফঝম্প করতে পারত? তাহলে দিবাকরের কলকাতায় কী আছে? আছে বিদেশি পণ্যের পথ-উপচানো বিজ্ঞাপন আর স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিকৃত চেহারা।

কিন্তু ফ্রেমের সামনে যেটা হয়, সেটা ব্যোমকেশের কোন্ কাহিনির পিরিয়ড পিস? কোনোটারই তো নয়! 'সত্যান্বেষী' গল্পের আগা, 'অর্থমনর্থম' গল্পের খোসা, আর 'মগ্নমৈনাক'-এর ল্যাজা—সব এখানে তালগোল পাকানো। অবশ্য হবে নাই-বা কেন? পরিচালকমশাই যে ব্যোমকেশের বত্রিশটি গল্পেরই কপিরাইট কিনে রেখেছেন! কাজেই অঞ্জন, ঋতুপর্ণ বা শৈবালের মতো এক-একটি কাহিনি নিয়ে ছবি করার মতো সময় কোথায় তাঁর? তাই বঙ্গদেশের এই সত্যান্বেষীকে রাতারাতি 'ইন্টারন্যাশনাল' বানাতে দাও সব ক'টা গল্পের ঘণ্ট পাকিয়ে—জেমস বন্ডের মতো, বা গাই রিচির পরিচালনায় শার্লক হোমসের মতো। এই যে ভদ্রলোক হোমসকে হঠাৎ পেল্লায় মারকুটে অবতারে জন্ম দিলেন ও সাংঘাতিক কেতা-কায়দাভর্তি অ্যাকশন-কাঁপাকাঁপি সুপারহিট হলিউডি ছবি করে ফেললেন, ব্যস, ভারতেও অমনি 'গাই' হওয়ার হুড়োহুড়ি।[৪৩] আর সেই হুড়োহুড়িতে শামিল হতে গিয়ে মূল ব্যোমকেশসহ অন্যান্য চরিত্রের চরিত্রায়ণ নিয়ে কীভাবে ছিনিমিনি খেলা হল, তারই কয়েকটা নমুনা পেশ করে আলোচনায় ইতি টানব।

ব্যোমকেশ-কাহিনির সঙ্গে পরিচিত সকলেই জানেন, জীবনে বেশ কয়েকটি তদন্তকেসে আইন-কানুনের ঊর্ধ্বে উঠে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ মানবিক ব্যোমকেশে পরিণত হয়েছে—যার কাছে আইনের চেয়েও বড়ো হল ন্যায়ধর্ম। আর সেখানেই সে হয়ে উঠেছে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী এক ডিটেকটিভ—আক্ষরিক অর্থেই একজন সত্যান্বেষী। তাই 'আদি রিপু' গল্পের শেষে স্বাধীনতার পুণ্য প্রভাতে দেশমাতৃকার চরণে ব্যোমকেশের ওই নোটের আহুতি এক আশ্চর্য কবিকল্পনার ফসল হয়ে দাঁড়ায়। না, প্রভাতকে সে পুলিশের হাতে সমর্পণ করেনি। কিন্তু এই সংসারে কর্মফল তো একেবারে এড়ানো যায় না! তাই প্রভাতকে তার পিতৃপরিচয় জানার শাস্তি দেয় ব্যোমকেশ। কিন্তু লক্ষ করার মতো, প্রভাতকে সেই শাস্তি দিয়েও তাঁরই পাশে দাঁড়িয়েছে ব্যোমকেশ। কারণ সে জানত, ওই শাস্তি পেয়েই প্রভাত নতুন জীবনপথে চলতে পারবেন। শুধরাতে পারেন রক্তের কলঙ্ক। কিন্তু প্রভাত যাকে নিজের হাতে খুন করেছে, সেই অনাদি হালদারকে নিজের বাবা বলে জানার অভিঘাতও কি কম? আর ঠিক সেখানেই ব্যোমকেশের সান্ত্বনা, তার আশ্বাসপ্রদান প্রভাতের মেরুদণ্ড সোজা করে। তাই, স্বাধীনতার প্রথম প্রভাতে ব্যোমকেশের হাতে জীবন ও শাস্তি— দু'এর একত্র প্রাপ্তিতেই জীবনের নতুন পথ চলা শুরু করেন প্রভাত।

এরকম অসামান্য কবিকল্পনাসুলভ পরিসমাপ্তির কাহিনি চিত্রপরিচালকদের হাতে পড়ে কী দাঁড়াল? বাসু চ্যাটার্জী 'আদিম রিপু'কে 'আদিম শত্রু' বানিয়ে, 'রিপু' ব্যঞ্জনার দফারফা ঘটিয়ে কাহিনিকে নিয়ে গেলেন ১৯৫৫-য়। আর তার শেষে নির্বিকার ভঙ্গিতে

প্রভাতকে ব্যোমকেশ বলে, 'আব আপ অ্যায়সা কিজিয়ে। মেরে সাথ পুলিশ স্টেশন চলিয়ে। ইয়ে যো রূপেয় হ্যায়, ওঁহা দে দিজিয়ে। আপনা জুলুম কবুল কিজিয়ে, অর জুলুম করনে কি বজা বাতাইয়ে। ...ম্যায় আপকো সাথ রহুঙ্গা। যো উচিত হ্যায়, ওহি হোগা'। বোঝা যায়, বাসু চ্যাটার্জীর 'আদিম শত্রু'তে প্রভাতই একা খুন করেননি, খুনির দলে নাম লিখিয়েছেন স্বয়ং পরিচালকও। তাঁর স্বেচ্ছাচারিতায় খুন হয়েছে শরদিন্দুর কালজয়ী ব্যোমকেশের ধ্রুপদী আখ্যানটি।

অঞ্জন দত্ত অবশ্য ঠিক এতটা স্বাধীনতা নিয়ে উঠতে পারেননি। একদিকে ১৯৬৩-তে কাহিনিকাল স্থির করে, অন্যদিকে শরদিন্দুর 'আদিম রিপু'র প্রতি 'বিশ্বস্ত' থাকতে গিয়ে সেই স্বাধীনতা দিবসেই ছবির পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন তিনি। ফলে ১৯৬৩-র ১৫ আগস্ট প্রভাতের বাড়ির ছাদে ব্যোমকেশের কুড়ি লক্ষ টাকা পোড়ানোটা শুধু হাস্যকর বা মেলোড্রামাটিক হয়ে উঠেছে, তাই-ই নয়; 'আদিম রিপু' টেক্সট-এ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিন কালো টাকা ভস্মীভূত করার পাশাপাশি প্রভাতকে তার পিতৃ-পরিচয় জানিয়ে ব্যোমকেশ যেভাবে তাকে 'অন্তরে-বাহিরে' স্বাধীন করে তোলে, সেই অভিঘাতকে অঞ্জন বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেন নি। আসলে তিনি তা চানও-নি। বরং, 'সেভেন' সিনেমার শেষাংশে মর্গান ফ্রিম্যান-এর বক্তব্য টুকে তিনি চেয়েছেন তাঁকে ট্রিবিউট দিতে।[৪৪]

আসলে, কিপটে বলে বাঙালির যতই বদনাম থাক, যেখানে-সেখানে 'ট্রিবিউট' দিতে বাঙালি একটুও কার্পণ্য করে না। অঞ্জনের পর তাই ট্রিবিউট দিতে আসরে নামেন ব্রাত্য বসু। 'অর্থমনর্থম' কাহিনির ভিত্তিতে ব্রাত্য ব্যোমকেশের মঞ্চায়ন ঘটান। চলচ্চিত্রে ব্যোমকেশ নব নব রূপে হাজির হচ্ছে। বক্স-অফিসও লক্ষ্মীর মুখ দেখছে। সেই ব্যোমকেশ-হাওয়ায় গা ভাসাতে ব্রাত্য বসু দাবি করে বসলেন, নাটকের মঞ্চে প্রথম তিনিই নাকি নিয়ে এলেন ব্যোমকেশকে। অথচ ব্যোমকেশের নাট্যমঞ্চায়নের ক্ষেত্রে তাঁর আগে আছে ২০১০-এ ভিন্টেজ থিয়েটার[৪৫], ১৯৮০-তে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে জ্ঞানেশ মুখার্জীর নির্দেশনায় পরিবেশিত 'বেণীসংহার'[৪৬] এবং আরও আগে, শরদিন্দুর জীবদ্দশাতেই, ১৯৪৬ সালে রঙমহলে অনিল চক্রবর্তীর পরিচালনায় মঞ্চস্থ 'মগ্নমৈনাক'।[৪৭] 'নাট্যব্যক্তিত্ব ব্রাত্য' সেই ইতিহাস অস্বীকার করে ব্যোমকেশের প্রথম নাট্যমঞ্চায়নের জন্য প্রচারের যাবতীয় আলো নিজের দিকে টেনে নিয়ে অতঃপর কী করলেন? 'অর্থমনর্থম' টেক্সট-এ ছিল, ব্যোমকেশের মুখে নিজের অপরাধের ব্যর্থতা বুঝতে পেরে খুনি ফণিভূষণ মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গিয়ে তার মুখখানা হয়ে ওঠে একেবারে মড়ার মতো। মনে হয়, তক্ষুনি তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাবেন। অসুস্থ বোধ-করা ফণীকে ইচ্ছে করেই আধ

ঘণ্টা সময় দেয় ব্যোমকেশ। আধ ঘণ্টা পর দেখা যায়, হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যা করেছেন ফণী। আর, ব্রাত্য-নির্দেশিত 'ব্যোমকেশ'-এ 'অকর্মণ্য' ফণী কী করেন? না, আত্মহননের আগে বেহালা বাজান। দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সী'তেও অনুকূল গুহ সত্যি সত্যি বেহালা না বাজালেও হাতের সূচীতীক্ষ্ণ ছড়িটি নিয়ে বেহালা বাজানোরই ভঙ্গি করেন। এই 'ট্রিবিউট', রোম ধ্বংসের সময় বেহালাবাদনরত সম্রাট নিরোর প্রতি, নাকি, বেহালা-বাজাতে সক্ষম পাশ্চাত্যের ডিটেকটিভ গল্পের অপরাধীকুলের প্রতি, নাকি সেই দুইয়েরই প্রতি, বোঝা ভার।

ট্রিবিউটের অবশ্য এখানেই শেষ নয়। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই মুক্তি পাবে শরদিন্দুর 'বহ্নিপতঙ্গ' অবলম্বনে ভেঙ্কটেশ ও সুরিন্দর ফিল্মস প্রযোজিত এবং অরিন্দম শীল পরিচালিত 'হর হর ব্যোমকেশ'। সেখানেও ব্যোমকেশের চোখে থাকবে চশমা। শরদিন্দু যতই ব্যোমকেশের চশমাকে অপছন্দ করুন না কেন, সত্যজিৎ রায়ের 'চিড়িয়াখানা'র হাত ধরে বাঙালির মনে চশমা-পরিহিত ব্যোমকেশের 'মিথ'কে ভাঙতে নারাজ অরিন্দম।[৪৮] কেন নারাজ? না, সত্যজিৎ রায়কে ট্রিবিউট দিতে হবে না! তাইতো সেই ট্রিবিউটের ঠ্যালায় 'বহ্নিপতঙ্গ'র ঘটনাস্থল পাটনা থেকে সোজা গিয়ে হাজির হয়েছে বেনারসে। কারণ সেখানেই যে শুটিং হয়েছিল সত্যজিৎ-এর 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর!

লেখককে কেউ ভুল বোঝার আগে জানিয়ে রাখি, সত্যজিৎ রায়কে অরিন্দমের এই ট্রিবিউট-প্রদান আমার সমালোচনার মূল লক্ষ্য নয়। বরং, ব্যোমকেশ-কাহিনির নানাবিধ পরিবর্তনের কারণ হিসেবে খাড়া-করা ট্রিবিউট-প্রদানের ওই একঝোঁকা মনোভাব-ই[৪৯] এই প্রসঙ্গে আমার আলোচনার ভরকেন্দ্র। মূল 'চিড়িয়াখানা' গল্পের শেষাংশ সত্যজিৎ যেভাবে পালটে দিয়েছিলেন, তাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ শরদিন্দু সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার দু'দিন আগে কলকাতা এলেও সিনেমাটি না দেখেই পুণায় ফিরে যান। তাঁর যুক্তি ছিল '... আমার গল্পের শেষটা যারা বদলে দিতে পারে, তাদের ছবি আমার ছবি নয়। ও তারাই দেখুক...'।[৫০] সেই ঘটনার পর আটচল্লিশ বছর কেটে গেছে। কিন্তু শরদিন্দুর সেই বক্তব্যকে পাত্তা না দিয়ে অস্যার্থে, লেখকের অভিপ্রায়ের প্রতি ট্রিবিউট না দেখিয়ে, বাঙালির মনে চলচ্চিত্র-সর্বস্বভাবে গড়ে-ওঠা ব্যোমকেশের মিথ্যে ডৌলকে, ট্রিবিউট-প্রদানের নামে অন্ধ-অনুসরণ আজও থামেনি। ভুল, সেটা যিনিই করুন না কেন, তা কখনও সত্য হয়ে ওঠে না। উঠতে পারে না। সম্যসা হল, বড়োমাপের মানুষ-কৃত সেই ভুল-ই আমাদের দেশে প্রামাণ্য হয়ে ওঠে। কারণ, সেই ভুলের চিহ্নিতকরণে বাঙালি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে অত্যন্ত সচেনতভাবে নীরব। তাই তো, ভুল-এর ট্রিবিউটে গড়ে ওঠে আরও এক ভুল।

ব্যোমকেশের কাহিনিতে শরদিন্দু ব্যোমকেশ-সত্যবতীর যে-দাম্পত্যের ছবি এঁকেছেন, তা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মতোই মধুর। তাদের মনকষাকষি হয়েছে ঠিকই। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে তা খুব স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু সুখী দাম্পত্যের অতলে অন্তঃশীলা ফল্গুর মতো প্রবাহিত পারস্পরিক শ্রদ্ধা থেকে কখনও তারা বিচ্যুত হয়নি। ফলে তাদের দাম্পত্যে উচ্চস্বরের কলহের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অঞ্জন ব্যোমকেশ-সত্যবতীর এহেন মিষ্টিমধুর দাম্পত্যের রসায়ন বুঝতে পারেননি। তাই তাঁর ব্যোমকেশ সত্যবতীকে অনায়াসে বলে, 'বেশি বাড়াবাড়ি করলে বাইরে গিয়ে মদ খেয়ে আসব।' বলে, 'পৃথিবীতে এমন কোটি কোটি দম্পতি আছে,যাদের মধ্যে কোনো ভাব-ভালোবাসা নেই। শুধুমাত্র বাধ্য হয়ে তারা একসঙ্গে থাকে। কারণ, তাদের ডিভোর্স দেওয়ার কোনো হিম্মত নেই। আজ যদি আমার জীবনে একটা বেলা বা যূথিকা আসে, কী করবে তুমি? কী করবে? মান-অভিমান করবে, রাগারাগি করবে। তারপর ফাইনালি তো মেনে নেবে!' অঞ্জনের ব্যোমকেশ-সত্যবতীর এই অসুখী দাম্পত্য আরও ভাঙনের মুখে দাঁড়ায় 'ব্যোমকেশ ফিরে এল'তে। সত্যবতী সেখানে কর্কশ স্বরে বলে, 'কী ভাবো কি তুমি নিজেকে? চোর-ডাকাত ধরেছ বলে আমার মাথা কিনে নিয়েছ? তোমার সংসারে আমি থাকব কেন বলো তো? একটা কারণ দাও তো! এক হাতে তালি বাজে না। সংসারে থাকতে গেলে ন্যূনতম দায়িত্ব পালন করতে হয়। টাকা দিলেই কিন্তু সংসারের সব দায়িত্ব পালন করা যায় না... চলে যাব আমি দাদার কাছে জন্মের মতো। তোমার গোয়েন্দাগিরি একেবারে ঘুচে যাবে।' ব্যোমকেশও উত্তেজিত, 'একদম বাড়াবাড়ি করবে না। চুপ করে থাকো।' এদিকে বাপ-মায়ের ঝগড়া শুনে জ্বরে-ভুগতে থাকা ব্যোমকেশের খোকার ঘ্যানঘ্যানানি আরও বেড়ে চলে। ছেলেকে শান্ত করার বদলে তিতিবিরক্ত সত্যবতীকে বলতে শোনা যায়, 'আমি মরছি নিজের জ্বালায়। সকাল থেকে ঘ্যানঘ্যান করছে। একটা চড় লাগাব।' হাত তুলে খোকাকে সত্যিই চড় কষাতে যায় সত্যবতী। বাধা দেয় অজিত। তখন সত্যবতীর তিরিক্ষি বাক্যবাণ থেকে রেহাই পায় না অজিতও। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো সত্যবতী বলে বসে, 'শোনো ঠাকুরপো, আমার কী বলার অধিকার আছে, আর কী বলার অধিকার নেই, সেটা বলার তুমি কেউ নও।' এর পরের ঘটনা আরও মারাত্মক। সে কেন বিয়ে করল না, ব্যোমকেশের সেই প্রশ্নে অজিতের উত্তর, 'আমি বিয়ে করলে তোমাদের বিয়েটা সামলাবে কে?' অর্থাৎ, ঘ্যানঘ্যানে ছেলে ও দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামীর সংসারের প্রতি হতশ্রদ্ধ সত্যবতী, আর সংসার নিয়ে 'ফাটা রেকর্ডের মতো এক কথা শোনানো' সত্যবতীকে সহ্য-করা ব্যোমকেশের বিয়েটা 'সামলানোর', তাকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব পালন করে চলেছে অঞ্জনের অবিবাহিত অজিত।

প্রশ্ন হল, শরদিন্দু তাঁর ব্যোমকেশ-সত্যবতীকে সত্যিই কি এরকমভাবেই এঁকেছিলেন? 'নবদম্পতির জীবন নির্বিঘ্ন করা বন্ধুর কাজ', এই ভাবনা থেকে ব্যোমকেশের বিয়ের পর অজিত অন্যত্র বাড়িভাড়া করে চলে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ব্যোমকেশের পাশাপাশি যে সত্যবতীও অজিতকে কাছছাড়া করতে চায়নি, সেই সত্যবতীর পক্ষে কি অজিতকে কখনও ওই রূঢ়, কর্কশ কথা শোনানো সম্ভব? গর্ভবতী সত্যবতী 'দুর্গরহস্য'য় যখন দাদার কাছে গিয়ে কয়েকদিন থাকতে চায়, তখন বেশ কিছুদিন সত্যবতীকে ছেড়ে থাকতে হবে ভেবে যে-ব্যোমকেশের 'ব্যথিত' নিঃশ্বাস পড়ে, ব্যোমকেশকে কিছুদিন দেখতে না পেলে যে-সত্যবতীর মন কেমন করে 'আদিম রিপু' গল্পে কিংবা 'হেঁয়ালির ছন্দ'য়, বেশ কয়েকদিন অনুপস্থিতির শেষে ওড়িশা থেকে ব্যোমকেশ হঠাৎ বাড়ি ফিরে এলে তাকে অপ্রত্যাশিতভাবে কাছে পাওয়ায় যে-সত্যবতীর চোখে ফুটে ওঠে 'আনন্দবিহ্বল জ্যোতি', অথবা, অজিত বিয়ে করেনি বলে তাকে 'দুধের ছেলে' ও 'অবোধ শিশু' জ্ঞানে ধর্তব্যের মধ্যে না-এনে তার সামনেই যে-ব্যোমকেশ নিজের আলোয়ানের অর্ধেকটা সত্যবতীর গায়ে জড়িয়ে দেয়, তার কোনো একটির সঙ্গেও কি মেলানো যায় অঞ্জনের ব্যোমকেশ বা সত্যবতীকে?

আসলে, ব্যবসা করতে গেলে বোধ হয় নারী-পুরুষ সম্পর্কের সূক্ষ্ম পরতগুলোকে স্পষ্ট মোটাদাগের আড়ালে ঢাকা দিতে হয়। করে তুলতে হয় সমসাময়িক। করে তুলতে হয় মেলোড্রামাটিক। তাই শরদিন্দুর 'কহেন কবি কালিদাস' আখ্যানে ফণীশ ও ইন্দিরার চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে প্রতিফলিত হয় ওই কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত অঞ্জনের 'ব্যোমকেশ বক্সী'তে। শরদিন্দুর ফণীশ 'বেশ শান্তশিষ্ট এবং ভালোমানুষ'। বাপের মতোই 'সুপুরুষ' হলেও তার 'দেহ-মনের পূর্ণ পরিণতি' তখনও ঘটেনি ... 'ভাবভঙ্গীতে একটু ছেলেমানুষের রেশ'। সে তাস খেলতে ভালোবাসলেও জুয়াড়ি নয়। কয়লা ক্লাবে অরবিন্দদের দলে পড়ে তাকে জুয়ার দলে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দল ছাড়ার চেষ্টা করলে পাছে তাকে দলের সকলের সামনে হাস্যাস্পদ হতে হয়, তাই ফণীশ 'নিতান্ত অনিচ্ছাভরে' জুয়ার দলে সংযুক্ত ছিল। মোহিনীর কুহকেও সে ভোলেনি। এমনকি, ব্যোমকেশের জেরার মুখে মোহিনীও ফণীশ প্রসঙ্গে জানিয়েছিল, 'কে কেমন মানুষ তা কি মুখ দেখে বলা যায় বাবু? তবে একজন ছিলেন সবচেয়ে ছেলেমানুষ আর সবচেয়ে ভালোমানুষ'। আর, শরদিন্দুর লিখনে ফণীশের বউ ইন্দিরা কেমন? তাকে দেখলেই বোঝা যায় যে, সে 'লাজুক মেয়ে'। অপরিচিত বয়স্থ ব্যক্তির সঙ্গে 'সহজভাবে আলাপ করার অভ্যাস' তার নেই।

এহেন ফণীশ-ইন্দিরা অঞ্জন দত্তর হাতে পড়ে কী হল? ফণীশের চরিত্রাভিনেতাকে দেখে 'ভালোমানুষ', 'ছেলেমানুষ' ইত্যাদি সদর্থক বিশেষণগুলোর উলটোটাই মনে

জাগে। সিনেমায় সে যে শুধু একজন পাক্কা জুয়াড়ি, তাই-ই নয়, মোহিনীর রূপমুগ্ধও বটে। মোহিনীর প্রতি ফণীশের সেই আকর্ষণই প্রাণহরির ব্ল্যাকমেলের অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। ওদিকে হাতকাটা ব্লাউজ পরিহিত, ঠোঁটে লিপস্টিক লাগানো ইন্দিরা বোধ হয় ৬০-এর দশকের শেষদিক-এর একজন 'আধুনিকা'। শরদিন্দুর যে-ইন্দিরা, নেহাত বাড়িতে পুরুষ নেই বলে 'বাধ্য হয়ে' 'বাইরের ঘরে এসে' ব্যোমকেশেদের জন্য অতিথি সৎকার করে, ব্যোমকেশের ইঙ্গিতে 'তেরছাভাবে সোফার কিনারায় বসে', 'শীর্ণ সংহত স্বরে' ফণীশের আশু বিপদের কথা জানায়—অঞ্জনের 'ব্যোমকেশ বক্সী'তে সেই ইন্দিরা কোথায়? অঞ্জনের ইন্দিরা তো ফণীশের বিপদের কথা জানাতে নিজে ব্যোমকেশ-অজিতের ঘরে ঢুকে সটান দরজা বন্ধ করে দেয়। কথা বলার শেষেও দরজা খোলার কথা তার মনেই থাকে না। অগত্যা সেই কাজ করতে হয় ব্যোমকেশকে। এখানেই শেষ নয়, সিনেমার শেষাংশে এসে জানা যায়, ফণীশের তুলনায় তার বন্ধু মৃগেন মৌলিককেই 'বেশি বিশ্বাস' করে ইন্দিরা এবং ব্যোমকেশের তদন্তে ফণীশ দোষী প্রমাণিত হলে ইন্দিরার পক্ষে ভবিষ্যতে ফণীশের সঙ্গে এক সংসারে থাকা সম্ভব হবে না। ফণীশ-ইন্দিরার এই নষ্ট দাম্পত্যের বিন্দুমাত্র আভাস-ও কি শরদিন্দুর লেখায় আছে?

শরদিন্দুর আখ্যানে ব্যোমকেশ ফণীশকে বলেছিল, 'তুমি যদি বৌমাকে নিয়ে কলকাতায় আসো, নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে দেখা করবে। বৌমাকে সত্যবতীর খুব পছন্দ হবে।' এরপর অজিতের সংযোজন, ব্যোমকেশ ফণীশকে সেই কথা 'বলিয়া যেন পুরাতন কথা স্মরণ করিয়া একটু হাসিল'। কেন? ইন্দিরাকে সত্যবতীর খুব পছন্দ হওয়ার কী কারণ? তাছাড়া, কোন্ 'পুরাতন কথা' 'স্মরণ' করে ব্যোমকেশের সেই বিশ্বাস জন্মেছিল? আসলে ইন্দিরা যেভাবে এই কেসে ব্যোমকেশের কাছে ফণীশের জন্য দরবার করেছিল, এক সময় সত্যবতীও তো নিজের দাদা সুকুমারকে বাঁচাতে ছুটে এসেছিল ব্যোমকেশের কাছে। অন্তর্গত সেই স্বধর্মেই সত্যবতী এবং ইন্দিরার মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিল ব্যোমকেশ।[৫১] কিন্তু অঞ্জন দত্ত এবং তাঁর ইন্দিরা সেই সম্ভাবনায় সমূল বিনাশ ঘটিয়েছেন। মনে প্রশ্ন জাগে, সুস্থ স্বাভাবিক একটি দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতি ব্যোমকেশ-পরিচালকরা এত বিতৃষ্ণ কেন? ঋতুপর্ণর 'সত্যান্বেষী'তে হিমাংশু-অলকা থেকে শুরু করে অঞ্জনের ব্যোমকেশ-সত্যবতী, বা ফণীশ-ইন্দিরা সকলেই কেন নষ্ট-দাম্পত্যের ফেরে ঘুরে বেড়ায়?

'অর্থমনর্থম'-এর অন্তিমে শরদিন্দুর ফণিভূষণ যখন আত্মহননের আগের মুহূর্তে চিঠিতে লেখেন, সুকুমার ফাঁসি গেলে তাঁর আর একটা সুবিধা হত, কিন্তু নিজের বিকলাঙ্গতার লজ্জায় যে-কথা তিনি জীবনে কখনও কাউকে বলতে পারেননি, শেষ

অবধি সেটা অপ্রকাশিতই থাক—তখন সেই না-বলা কথার মূর্ছনা রসজ্ঞ পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু বাসু চ্যাটার্জীর 'ওয়াসিয়ৎ'-এর শেষে ফণী যখন চিঠিতে লেখে, 'আজ কহেনে মে মুঝে কোই সংকোচ নেহি, ম্যায় হামেশা সত্যবতীকো চাহ্‌তা থা। আর ইস সারি ষড়যন্ত্র মে উসে পানে কি ইচ্ছে ভি কহি বহুত প্রবল থি', তখন সেই স্পষ্ট উচ্চারণ, অনুচ্চারিত শব্দের দ্যোতনাকে হারিয়ে ফেলে। আর ঠিক সে-কারণেই, সুকুমারের ওপর আরোপিত-খুনের কলঙ্ক মুছে-দেওয়া ব্যোমকেশের পায়ে গলায় আঁচল জড়ানো সত্যবতীর নিঃশব্দ প্রণাম তথা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের ভাষার ব্যঞ্জনাকে বুঝতে না পেরে দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ যখন সত্যবতীর কাছে তার দাদাকে বাঁচানোর 'ইনাম' চেয়ে বসে, তখন সেই প্রবল মানসিক ধাক্কা সামলাতে গিয়ে মনে হয়, নৈঃশব্দ্য যে কখনো-কখনো শব্দকেও অতিক্রম করে যায়, চলচ্চিত্রের মতো শক্তিশালী গণমাধ্যম ব্যোমকেশের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করতে পারেনি।

'চোরাবালি' অবলম্বনে নির্মিত ঋতুপর্ণ ঘোষের 'সত্যান্বেষী'তে আবার কে যে প্রকৃত সত্যান্বেষী, তাই নিয়েই সংশয় জাগে। একে তো হিমাংশুর স্ত্রী অলকা মনে করেন, ব্যোমকেশের তুলনায় অজিত বেশি 'তুখোড়'। শুধু তাই নয়, শেষে অজিতকে বলেই বসেন, 'আপনি না সত্যান্বেষী।' আর অজিতও বোধ হয় অলকার কথাতেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে ব্যোমকেশকে জ্ঞান দেয় 'At the end of the day মনে রেখো আমরা সত্যান্বেষী। 'এখানে লক্ষ করার মতো ওই 'আমরা' শব্দটা। অর্থাৎ কিনা, ব্যোমকেশের পাশাপাশি অজিতও সত্যান্বেষী। আবার কালীগতি বলে বসেন, 'আমার একটাই পরিচয়, আমি সত্যান্বেষী।' এত সত্যান্বেষীর ভিড়েই বোধ হয় প্রকৃত সত্যান্বেষী ব্যোমকেশকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

সত্যজিৎ রায়ের 'চিড়িয়াখানা'য় ব্যোমকেশ একটা বোর্ডে সন্দেহভাজনদের ছবি আটকে নেতিবাচক অনুমানে এক-একজনকে বাতিল করেছিল। অঞ্জন দত্তর ব্যোমকেশ আবার বোর্ডে ছবির বদলে সন্দেহভাজনদের নাম আটকায়। সেই ব্যোমকেশের হাতে একটা লম্বা পয়েন্টিং স্টিক থাকলেই একবার 'পারফেক্ট ট্রিবিউট টু সত্যজিৎ রায়' হয়ে যেত।[৫২] শৈবাল মিত্রের আধুনিক ব্যোমকেশ ধৃতিমান-ও লোভ সংবরণ করতে পারেননি। তাই ধৃতিমানও white board-এ কালো মার্কার দিয়ে পরপর লিখে চলেন, কোন্ তারিখে কোন্ রাস্তায় ক'টা থেকে ক'টার মধ্যে হত্যাকারীর শিকার হয়েছেন নিরপরাধ মানুষ। কিন্তু সন্দেহভাজনদের নিয়ে চিন্তা করার সময় তাদের নাম বা ছবি, কোনোটাই চাক্ষুষ করার প্রয়োজন আদৌ কি পড়ত ব্যোমকেশের? সে তো মনের গভীরে ডুব দিয়ে একের-পর-এক সন্দেহভাজনকে বিশ্লেষণ করত। তার সেই মানসিক চিন্তনকে দর্শনেন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভরশীল করানোয় সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের কতখানি অবনমন ঘটেছে, তার খবর কে রাখে?

অন্তত অঞ্জন দত্ত তো রাখেননি। রাখলে কি আর তাঁর ব্যোমকেশ-রূপী যিশু সেনগুপ্ত, ভুবন আর মোহিনীকে নিজেদের ট্যাক্সি করে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়? পুলিশ চাইলে সেই ট্যাক্সি নম্বরের সূত্রে অতি সহজেই যে ভুবন-মোহিনীকে ধরে ফেলতে পারে, এই সাধারণ বুদ্ধিটুকু অঞ্জন কী করে তাঁর ব্যোমকেশের মস্তিষ্কে প্রদান করতে ভুলে গেলেন, আর তাঁর সেই ভুলে ব্যোমকেশ চরিত্র কতখানি হাস্যাস্পদ হয়ে দাঁড়াল, তার থই পাওয়া ভার।

দিবাকরের ছবিতে আবার এক আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ভেদ করতে দেখা যায় ব্যোমকেশকে, যা কখনো শরদিন্দুর ব্যোমকেশ করেনি। তাই চিত্রনাট্যের উল্লম্ফনের কথা ভাবলে, এই চলচ্চিত্রের পোস্টারে-থাকা লম্ফরত ব্যোমকেশের ছবিটি সত্যিই প্রতীকী হয়ে ওঠে। মূল কাহিনিতে মেস-মালিক অনুকূলবাবু আদ্যন্তই ভিলেন। কোকেনের ব্যবসায়ী তথা নৃশংস এক খুনি। ব্যোমকেশ বা পাঠক তাকে কোনোভাবেই উচ্চমার্গের মানুষ বলে মনে করেননি। কিন্তু দিবাকরের ছবিতে মেস-মালিক অনুকূলবাবু আলো-আঁধারিতে-মেশা এক মানুষ। সুকুমার সেনের ব্যাখ্যায় যে-ধরনের মানুষকে বলে 'সুপার ক্রিমিনাল'। সেই চরিত্রে নীরজ কবি-র 'লার্জার দ্যান দ্য লাইফ' অভিনয় এই ব্যাপারটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। তাই ব্যক্তিত্বের দিক থেকে অনুকূলবাবু ছাপিয়ে গেছেন ব্যোমকেশকে।[৫৩] এ আসলে পরিচালকের অভিপ্রায়-প্রসূত। তাই এক সাক্ষাৎকারে দিবাকর বলেই ফেলেন, 'সুপারহিরো ভাবটা আসছে ব্যোমকেশ থেকে নয়, অনুকূলবাবু থেকে'।[৫৪] ব্যোমকেশ চরিত্রে সুশান্ত সিং রাজপুতের নির্লিপ্ত আর দুর্বল কণ্ঠের অভিনয় ব্যাপারটাকে যে আরও মান্যতা দিয়েছে, সন্দেহ নেই। তাঁর চোখে একবারের জন্যও ব্যোমকেশের বুদ্ধির ঝিলিক পাওয়া যায়নি। তাঁর মধ্যে কোথায় সেই স্থিতধী, সংযতবাক ব্যোমকেশ? অথচ, টিউশনের ছাত্রীর পাণিপ্রার্থনা করতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত সেই ব্যোমকেশই নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছে মাতাহারি অঙ্গুরী দেবীর চুম্বন। এমনকি ভদ্রতার সীমা পেরিয়ে সটান স্নানঘরে ঢুকে অর্ধনগ্ন অঙ্গুরীর বাথটবের ধারে বসে কথা বলতেও সেই ব্যোমকেশ নিঃসংকোচ। অঙ্গুরী দেবীর চরিত্রটি যে ঠিক কী, তা অঙ্গুরীর চরিত্রাভিনেত্রী স্বয়ং স্বস্তিকার কাছেও স্পষ্ট নয়। সম্ভবত স্পষ্ট ছিল না পরিচালকের কাছেও। তিনি শুধু জানতেন, 'একটা রমরমিয়ে গল্প' বলতে গেলে, তাকে 'রগরগে' করে তুলতে হলে, 'রাবীন্দ্রিক ছবি'র মতো 'কাব্যিক কোনো ব্যাপার' রাখলে চলবে না।[৫৫] রাখতে হবে সেক্স-সিডাকশন-ভায়োলেন্স। পরিচালক তথা ব্যবসায়ী দিবাকর তাঁর প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন বটে।

প্রশ্ন হল, ব্যোমকেশকে নিয়ে ব্যবসা করতে নেমে এই যে এক-একজন এক-এক রকমভাবে শরদিন্দুর ব্যোমকেশ কাহিনিকে deconstruct করছেন, interpreta-

tion হিসেবে তার গ্রাহ্যতা কতখানি? পোস্টমর্ডানিজকে শিখণ্ডী খাড়া করে কোনো টেক্সটের interpretation করতে গেলে, সেই টেক্সটের সহনশীলতার সীমারেখাটিকেও জেনে রাখা জরুরি। কারণ, ...too much interpretation can lead us to see what we want to, rather than the quite specific intention of the author.'।[৫৬] টেক্সটের নবতর ব্যাখ্যা হিসেবে যা বলা হচ্ছে, সেটা লেখকের অভিপ্রায়-প্রসূত ওই টেক্সট দ্বারা আদৌ সমর্থিত কিনা, সেই বিবেচনাবোধ না থাকলে কী হয়? না থাকলে অঞ্জন দত্তর মতো পরিচালক ব্যোমকেশ অজিত সম্পর্কে 'deliberately' 'homosexual element' দেখাতে চান।[৫৭] মনে প্রশ্ন জাগে, দুই সমকামী পরস্পরের বন্ধু হতেই পারেন, কিন্তু সমলিঙ্গে সখ্য মানেই কি সমকামী? না কি, সমকামিতার জের টেনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই এই যুগে 'বন্ধুত্ব'-র নিয়তি? ব্যোমকেশ-অজিতের সমকামী সম্পর্কের পরিস্থিতিগত কোনো সম্ভাবনাই তো শরদিন্দুর ব্যোমকেশ-কেন্দ্রিক টেক্সটে নেই! অভিধায় তো বটেই, এমনকি লক্ষণা কিংবা ব্যঞ্জনাতেও কি আছে? বোঝা যায়, অঞ্জন সমকামিতাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আসলে, পণ্য না করলে এখন আর 'আধুনিক' 'পোস্টমডার্ন' হওয়া যায় না। কিন্তু interpretation মানেই কি কোনো টেক্সটের অসীম অনন্ত ব্যাখ্যা? 'Interpretation and Overinterpretation'-এ উম্বার্ত ইকো বলেছেন, 'To interpret a text means to explain why these words can do various things (and not others) through the way they are interpreted.'।[৫৮] কাজেই মূল টেক্সটের ভাবাস্বাদন নয়, তার রসাস্বাদনই interpretation-এর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তার পরিবর্তে, সস্তা জনপ্রিয়তা কুড়োনোর জন্য, টেক্সটের অপব্যবহার এবং অধিকাংশ গণমাধ্যম-কর্তৃক তার নীরব সমর্থন এটা কি বর্তমান যুগে নৈঃশব্দ্যের বাজারি রাজনীতির অঙ্গ নয়?

উৎস ও অনুষঙ্গ :

১. দেবাশিষ মুখোপাধ্যায়, 'গোয়েন্দা নয় সত্যান্বেষী *আজকাল* (টেলিভিশন), নভেম্বর ১৯৯১ পৃ. ৭০।

২. তদেব।

৩. ২৫.০৭.২০১৩-য় এক সাক্ষাৎকারে [*The Telegraph*(t_2)p.10] দিবাকর জানাচ্ছেন, 'My Byomkesh is a 22-23 year-old young man, fresh out of college, who for the first time in his life shows an interest in becoming a detective. He isn't a 'Satyanweshi', but is well on his way to becoming one'. ১৯৪৩-এ

'ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সী'র ঘটনাকাল স্থির করেছেন দিবাকর। কাজেই ১৯৪৩-এ ব্যোমকেশের বয়স ২২-২৩ হলে, হিসেব অনুযায়ী ১৯২০-২১ নাগাদ-ই তার জন্ম।

৪. করালীচরণ বসুর মার্ডার কেসে মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা আগে একটি উইল করেন করালীচরণ। সেটিই তাঁর শেষ উইল। তাতে লেখা ছিল 'অদ্য ইংরাজী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে, আমি সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে এই উইল করিতেছি যে...।' ওই রাতেই করালীচরণ খুন হন। ডেপুটি কমিশনার বিধুবাবু ব্যোমকেশকে বলেছেন, 'এবাড়ির কর্তা করালীবাবু গতরাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন হয়েছেন।' মানে, অজিত-সহ ব্যোমকেশ ঘটনাস্থলে যাচ্ছে ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩-এ। পরের দিন, মানে, ২৪-এর বিকেলেই ব্যোমকেশদের 'ব্যাচেলর এস্টাবিলশমেন্ট'-এ পা রাখছে সত্যবতী। সে বিদায় নেওয়ার পর ব্যোমকেশের প্রশ্ন, '...অজিত, তোমার বয়স কত হল বল দেখি?... কত বছর ক'মাস ক'দিন, ঠিক হিসেব করে বল।' অজিতের হিসেব, 'উনত্রিশ বছর পাঁচ মাস এগারো দিন।' শুনে ব্যোমকেশ একাট ভারী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'যাক, তুমি আমার চেয়ে তিন মাসের বড়।' ১৯৩৩-এ দাঁড়িয়ে অজিতের বয়স উনত্রিশ বছর পাঁচ মাস এগারো দিন। অর্থাৎ অজিতের জন্ম ১৩ এপ্রিল, ১৯০৪। ব্যোমকেশ অজিতের চেয়ে তিন মাসের ছোটো। মানে, ১৯০৪-এর ১৩ জুলাই ব্যোমকেশের জন্ম।

৫. ব্যোমকেশের ম্যাট্রিকুলেশন, ইন্টারমিডিয়েট ও কলেজ-সময়ের ক্ষেত্রে এই তিনের হিসেব করা হয়েছে শরদিন্দুর ব্যাক্তিজীবনের নিরিখে। শরদিন্দু বলেছেন, 'জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করি ১৯১৫ সালে। তারপর কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হলাম। ...১৯১৯ সালে বি.এ. পাশ করি।' (শোভন বসু, 'শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়', *দেশ*, ১৬ আশ্বিন ১৩৭৭, পৃ. ৯৭২) ১৮৯৯-এ জাত শরদিন্দুর ম্যাট্রিক ষোলো বছর বয়সে। আর কুড়ি বছর বয়সে কলেজের পড়া শেষ করেন তিনি। শরদিন্দুর অত্যন্ত প্রীতিভাজন মোহিনী মিল্‌সের কর্ণধার প্রয়াত শ্রী দুর্গাদাস চক্রবর্তীর পুত্র শ্রী প্রবীর চক্রবর্তী ১৯.০৯.২০১০ তারিখে এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে প্রাবন্ধিককে জানিয়েছেন, প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনোয় শরদিন্দুর কোনো বছর নষ্ট (year-lack) হয়নি। কাজেই সেই হিসেবে ১৯০৪-এ জাত ব্যোমকেশের ষোলো বছরে, মানে ১৯২০তে ম্যাট্রিকুলেশন। ম্যাট্রিকের পর তদানীন্তন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় দু' বছরের ইন্টারমিডিয়েট কোর্স করতে হত। তারপর ছিল দু'বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রি। (তথ্যসূত্র: বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, *স্মৃতিকথা*, প্রথম খণ্ড, বিদ্যাসাগর বুক স্টল, ১৩৫৬, পৃ. ৩৮৬-৪৭১)। সেদিন থেকে ১৯২২-এ ব্যোমকেশের ইন্টারমিডিয়েট কোর্স শেষে কলেজে ভর্তি হওয়া এবং ১৯২৪-এ পাকাপাকিভাবে কলেজের পাট গুটোনো। এখন, ব্যোমকেশ কোন্ কলেজে পড়ত? 'দুর্গরহস্য-য় ব্যোমকেশ জানাচ্ছে, বহরমপুরে সে কিছুদিন ঈশানচন্দ্র মজুমদারের ছাত্র ছিল। আর ১৮৫৩ থেকে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় একমাত্র মহাবিদ্যালয় বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ (তথ্যসূত্র : বিষাণ কুমার গুপ্ত, *ইতিহাসের আলোকে বহরমপুর পৌরসভা (১৮৭৬-২০০৭)*, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পৃ. ৬৭।

৬. 'সত্যান্বেষী'র গোড়াতেই অজিত লিখেছে, 'সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল সন তেরশ' একত্রিশ সালে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো শেষ করিয়া সবেমাত্র বাহির হইয়াছি।'

1298-1299) বলছে, ১৯২৯-এর ইংরিজি বর্ষপঞ্জিতে ১০ ও ১১ মার্চ যথাক্রমে রবি ও সোমবার ছিল। তাই আমাদের অনুমান, গ্রামোফোন পিন মার্ডার কেসের সময়কাল ১৯২৯।

১৯. *গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা ও ডাইরেক্টরী*, ১৩৩৯।

২০. "I started Byomkesh after proper planning. We are showing 'Chitrochor' as a continuation of 'Adim Ripu'... 'Abar Byomkesh' is a continuaion of 'Byomkesh Bakshi'." Intervies of Anjan Dutt, *The Telegraph* (t2), 23.03.2012, p. 10.

২১. এগিয়ে যাই 'দুর্গরহস্য' বা ঈশানচন্দ্র মজুমদার মার্ডার কেসে। এই কেস ফাল্গুনী মার্ডার কেসের এক বছরের মধ্যে ঘটেছে। অজিত সেখানে শুরুই করে এই বলে যে, 'ব্যোমকেশের শরীর সারাইবার জন্য সাঁওতাল পরগনার যে শহরে হাওয়া বদলাইতে গিয়েছিলাম বছর না ঘুরিতেই যে-আবার সেখানে যাইতে হইবে, তাহা ভাবি নাই।' অর্থাৎ , ঈশানচন্দ্র মজুদার মার্ডার কেসের ঘটনাকাল হিসেব করলেই ফাল্গুনী মার্ডার কেসের সময় হিসেব করা যাবে।

ব্যোমকেশের প্রশ্নের উত্তরে রামকিশোর জানিয়েছিলেন, তাঁর দাদা রামবিনোদ 'প্রায় ত্রিশ বছর' হল মারা গেছেন। ওদিকে ব্যোমকেশের জেরার-মুখে-ভেঙে-পড়া চাঁদমোহন জানান, '১৯১১ সালের শীতকালে আমরা মুঙ্গেরে ছিলাম। রামবিনোদ আর রামকিশোরের তখন ঘিয়ের ব্যবসা ছিল, কলকাতায় ঘি চালান দিত। ... হাঠাৎ একদিন মুঙ্গেরে প্লেগ দেখা দিল। রামবিনোদ আর রামকিশোর তখন মুঙ্গেরে, তারা বড় মুশকিলে পড়ল। .. এইভাবে দশ বারো দিন কেটে গেল। তারপার একদিন রামবিনোদকে প্লেগে ধরল। ... রামবিনোদ পরের দিনই মারা গেল।'

এখন তিরিশ বছরে কড়াকড়ি হিসেব ধরলে দাঁড়ায় ১৯৪১। কিন্তু ঈশানচন্দ্র মজুমদার মার্ডার কেসের সময়কাল সময়কাল যদি হয় ১৯৪১-এর 'কার্তিক' অর্থাৎ মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বর, তাহলে ফাল্গুনী মার্ডার কেসের ঘটনাকাল ১৯৪০-এর মধ্য-ডিসেম্বর। অথচ, *Whitakers Almanack 2001* (Joseph Whitaker, The Stationary Office Ltd, London.p. 92) বলছে, ১৯৪০-এর ৩১ ডিসেম্বর ছিল মঙ্গলবার, ফাল্গুনী পাল মার্ডার কেস অনুযায়ী যা হওয়ার কথা রোববার। *Whitakers* -ই জানাচ্ছে, ১৯৪০-এর কাছাকছি সময়ে ৩১ ডিসেম্বর রোববার পড়েছিল ১৯৩৯ সালে। সেদিক থেকে ঈশানচন্দ্র মজুমদার মার্ডার কেসের ঘটনাকাল ১৯৪০। আর ১৯৪০-এ দাঁড়িয়ে ১৯১১-য় মৃত রামবিনোদ প্রসঙ্গে রামকিশোর বলতেই পারেন, সে 'প্রায় ত্রিশ বছর' আগের ঘটনা। কাজেই আমাদের অনুমান, ফাল্গুনী পাল মার্ডার কেসের সময়কাল ১৯৩৯।

২২. অঞ্জন দত্ত, 'ব্যোমকেশই আমাকে বাঙালি করে তুলেছ,' *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৫.০৩.২০১২ পৃ. ৪।

২৩. অনিরুদ্ধ ধর, 'আবার ব্যোমকেশ-এর 'একটি সাধারণ আলোচনা, *একদিন* (বায়োস্কোপ), ৩০.০৩.২০১২, পৃ. ১।

২৪. চণ্ডী মুখোপাধ্যায়, যা ব্যোমকেশ করেছেন, তারপর আবার ব্যোমকেশ নিয়ে জ্ঞানদান। ছিঃ অঞ্জন, *খবর ৩৬৫ দিন*, ৩০.০৩.২০১২, পৃ. ৪।

১৯৪০ থেকে 'চার বছর' পিছিয়ে গেলে সময় দাঁড়ায় ১৯৩৬। অর্থাৎ, সেই বছরই বিয়ে করেছে ব্যোমকেশ-সত্যবতী।

১০ 'দুর্গরহস্য' বা ঈশানচন্দর মজুমদার মার্ডার কেসের ঘটনাকাল ১৯৪০-এর অক্টোবর (দ্রষ্টব্য, টীকা নং :৯) কেস হাতে নেওয়ার ছ'দিন পর যবনিকাপাত। সেদিনই পান্ডের বাড়িতে গিয়ে টেলিগ্রাম মারফত ব্যোমকেশ ছেলে হওয়ার খবর জানতে পারে। কাজেই, সময়ের হিসেবে তখন অক্টোবরের শেষাশেষি।

১১. 'রুম নম্বর দুই' থেকেই অজিতকে সরিয়ে সর্বজ্ঞ কথকের আসন নিচ্ছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। 'রুম নম্বর দুই' শেষ হচ্ছে ১৯৬৪-র ১৩ জুলাই। অর্থাৎ, মোটের ওপর বলা যেতে পারে, ১৯৬৪ থেকেই সেই দায়িত্ব নিচ্ছেন শরদিন্দু। ১৯৬৪-র সেপ্টেম্বরের চিঠিতে শরদিন্দু প্রতুল গুপ্তকে জানাচ্ছেন, 'অজিতকে বক্তার আসন থেকে সরিয়ে দিয়েছি এবং চলতি ভাষার প্রবর্তন করেছি।' পুনশ্চ, আর একটি চিঠিতে, 'অজিতকে বক্তার গদি থেকে নামিয়ে দেবার জন্যে কেউ কেউ চটেছেন।' (প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত 'ব্যোমকেশ, সত্যবতী, সত্যবতীর গাড়ি' *ব্যোমকেশ সমগ্র*)। এখানে লক্ষ করার মতো, সর্বজ্ঞ কথকের বয়ানে লেখা প্রথম গল্প 'রুম নম্বর দুই' লিখন শেষের তারিখটি ১৩ জুলাই, ১৯৬৪। ব্যোমকেশের বয়স তখন ঠিক ষাট।

১২. 'রক্তের দাগ'-এর শুরুতেই অজিত লিখছে, 'স্বাধীনতার পর প্রথম বসন্ত ঋতু আসিয়াছে।' ১৯৪৭-এর আগস্টে স্বাধীনতা। তারপর 'প্রথম বসন্ত ঋতু' অর্থে ১৯৪৮-এর মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য-এপ্রিলের মাঝের কোনো দিন।

১৩. প্রিয়দর্শিনী রক্ষিত, 'শার্লকাচ্ছন্ন', *আনন্দবাজার পত্রিকা* (আনন্দপ্লাস), ১৯.০২.২০১৪, পৃ. ৯।

১৪. শান্তনু চক্রবর্তী, 'ব্যোমকেশ ম্যানিয়া' *আনন্দবাজার পত্রিকা* (রবিবাসরীয়), ১২. ০৪.২০১৫, পৃ. ৯।

১৫. ১৩৫৩-র *গুপ্তপ্রেশ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা* থেকে জানা যাচ্ছে, ১৯৪৬ সালের কালীপুজো ছিল ২৪ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার (পৃ. ১২৭)। আর, 'আদিম রিপু' কাহিনি শেষ হচ্ছে ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার দিন। কাজেই, অনাদি হালদার মার্ডার কেস বা 'আদিম রিপু' কাহিনির সময়কাল ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট।

১৬. অঞ্জন দত্ত-র সাক্ষাৎকার, *একদিন* (জীবনযাপন), ৩১.০৭.২০১০ পৃ. ১-২।

১৭. শান্তনু চক্রবর্তী, 'ব্যোমকেশ ম্যানিয়া', *আনন্দবাজার পত্রিকা* (রবিবাসরীয়), ১২.০৪.২০১৫, পৃ. ৯।

১৮. প্রফুল্ল রায় অজিতকে যে-চিঠি দিয়েছিল, তাতে লেখা ছিল, 'রবিবার ১০ই মার্চ' রাত বারোটায় সাইকেল আরোহীর সঙ্গে মোলাকাতের কথা। আর, প্রফুল্ল রায় নিজে এসে ব্যোমকেশকে যে-চিঠি দেখায়, সেখানে উল্লেখ ছিল 'সোমবার ১১ই মার্চ'-এর কথা। এখন, 'পথের কাঁটা' লেখা হচ্ছে ৭ আষাঢ়, ১৩৩৯। মানে ইংরিজি সালের হিসেবে ১৯৩২। আর অশ্বিনী মার্ডার কেসের ঘটনাকাল ১৯২৫-এর এপ্রিল। কাজেই গ্রামোফোন পিন মার্ডার কেসের সময়কাল ১৯২৫-থেকে ১৯৩২-এর মধ্যবর্তী কোনো সময়ে, যে-বছর ১০ ও ১১ মার্চ যথাক্রমে রবি ও সোমবার ছিল। *Whitaker's Almanack 2006* (Joseph Whitaker, A & C Black Ltd. London, 2005, p.

২৫. সীমন্ত-হীরে কেসের ঘটনাকাল সংক্রান্ত কোনো তথ্য না-মেলায় লিখনকালের ওপরই ভরসা করতে হয়েছে। 'সীমন্ত-হীরা' লেখা শেষ হচ্ছে ৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯। ইংরিজির হিসেবে মধ্য নভেম্বর, ১৯৩২। কাজেই ব্যোমকেশের কাছে সীমন্ত হীরের কেসটি আসার সর্বনিম্ন সময়ও সেটিই।

২৬. '... in 1923, the library was allotted a portion of the Foreign and Military Secretariet Buildings at 5, Esplanade East, to which building the library was gradually shifted... Even this accommodation did not satisty the authorities of the Library, because the accommodation provided in the building had very little scope for expansion. War exigencies made it necessary for the temporary transfer of the Library to private accommodation in the Jabakusum House at 34, Chittaranjan Avenue in February, 1942 (তথ্যসূত্র : B.S. Kesavan, *India's National Library*, National Library Publication, 1961, p. 18-19)

মানে, ১৯৩২-এ ব্যোমকেশ যখন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি যাচ্ছে, তখন তার ঠিকানা ওই ৫ নম্বর এসপ্ল্যানেড ইস্ট।

২৭. এই সময়কালের হিসেবের জন্য আমাদের যেতে হবে 'উপসংহার' কাহিনিতে। সেখানে অনুকূলবাবু অজিতকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনাদের এই বাসাটি দিব্যি নিরিবিলি...কতদিন এখানে আছেন? অজিতের উত্তর ছিল, 'আমি আছি বছর আষ্টেক।' অজিত হ্যারিসন রোডে ব্যোমকেশের বাড়িতে আসে ১৯২৫-এ। কাজেই 'উপসংহার'-এর সময়কাল ১৯৩৩। মাসের হিসেবে, জানুয়ারির শেষাশেষি। কারণ, 'উপসংহার' শুরুই হয়, 'হাইকোর্টে দেবকুমারবাবুর মামলা শেষ হইয়া গিয়াছিল। মাঘ মাসের মাঝামাঝি।'

২৮. "We're bowing out", Interview of Rituparno Ghosh and Prasenjit Chatterjee, *The Telegraph* (t_2) 17.04.2009, p.5

২৯. শান্তনু চক্রবর্তী, 'ব্যোমকেশ ম্যানিয়া' *আনন্দবাজার পত্রিকা* (রবিবাসরীয়), ১২.০৪.২০১৫, পৃ. ৯

৩০. দ্রষ্টব্য : টীকা নং ২৭।

৩১. ১৯৩৩-এর জানুয়ারিতে সংঘটিত 'উপসংহার' কাহিনিতে ব্যোমকেশ বলে (দ্রষ্টব্য : ২৭ নং টীকা), আদালতের বিচারে পিনাল কোডের কয়েক ধারার পেশোয়ারী আমীর খাঁ-র বারো বছর জেল হয়। ১৯৩৩-এর জানুয়ারিতেও তার ছাড়া পাওয়ার সময় হয়নি। অর্থাৎ আমীর খাঁ-র কারাবাসজীবন শুরুর সর্বনিম্নসীমা ১৯২১-এর ফেব্রুয়ারি। ব্যোমকেশের কাছে আমীর খাঁ-র কেস আসছে নিশ্চয়ই তার আগে। কাজেই এই কেসের সর্বনিম্ন সময়সীমা তাই ১৯২১।

৩২. দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায়, "'বরফি' 'কহানি'র দর্শক আমার ব্যোমকেশ দেখুন, তাই বাঙালি অভিনেতা খুঁজিনি, বেছেছি সুশান্তকে" *খবর ৩৬৫ দিন* (বিবি), ২৬.০৭.২০১৩, পৃ. ৬।

৩৩. বিশেষ ১০০ পর্ব-র 'ব্যোমকেশ' কালার্স বাংলা চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয়েছিল ১০.০৭.২০১৫ তারিখে রাত ৯-টায়।

৩৪. করালীচরণ বসু মার্ডার কেসে মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা আগে একটি উইল করেন করালীচরণ। সেটিই তাঁর শেষ উইল। তাতে লেখা ছিল, 'অদ্য ইংরাজী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২২ শে সেপ্টেম্বর তারিখে, আমি সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে এই উইল করিতেছি যে ...। 'ওই রাতেই করালীচরণ খুন হন। ডেপুটি কমিশনার বিধুবাবু ব্যোমকেশকে বলেছেন, 'এ বাড়ির কর্তা করালীবাবু গতরাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন হয়েছেন।' মানে, অজিত-সহ ব্যোমকেশ ঘটনাস্থলে যাচ্ছে ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩-এ। পরদিন, মানে, ২৪-এর বিকেলেই ব্যোমকেশদের 'ব্যাচেলর এস্টাবলিশমেন্ট'-এ পা রাখছে সত্যবতী। আর পঞ্জিকা জানাচ্ছে সেদিন ছিল রবিবার, তিথির হিসেব দুর্গাপঞ্চমী। (*গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা ও ডাইরেক্টরী*, ১৩৪০, পৃ. ১০৮)

৩৫. 'রক্তমুখী নীলা' বা 'হরিপদ রক্ষিত মার্ডার কেসের শুরুতেই দেখি, 'দৈনিক কালকেতু'মগ্ন ব্যোমকেশ অজিতকে বলছে, 'খবর গুরুতর...দু'জন দাগী আসামী সম্প্রতি মুক্তিলাভ করেছে। একজন হচ্ছেন শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন—তিনি মুক্তিলাভ করেছেন বিচিত্রা নামক টকি হাউসে, আর একজনের নাম শ্রীযুত রমানাথ নিয়োগী—ইতি মুক্তিলাভ করেছেন আলিপুর জেল থেকে।' ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত নির্বাক চলচিত্র 'চরিত্রহীন' মুক্তি পাচ্ছে ৯ মে, ১৯৩১-এ (তথ্যসূত্র : Ansu Sur (Ed), *Bengali Film Directory*, West Bengal Film Centre, March 1999 p. 6)

৩৬. অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়, 'ব্যোমকেশ নয় বিশুদ্ধ বোম্বাচাক', *একদিন* ২২.০৮.২০১০, পৃ. ৪।

৩৭. তদেব।

৩৮. তদেব।

৩৯. জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ব্যোমকেশ সফল, পরিচালক নন *আনন্দবাজার পত্রিকা* (পত্রিকা), ৩১.০৩.২০১২, পৃ. ৪।

৪০. চণ্ডী মুখোপাধ্যায়, 'যা ব্যোমকেশ করেছেন, তারপর আবার ব্যোমকেশ নিয়ে জ্ঞানদান! ছিঃ 'অঞ্জন' খবর *৩৬৫ দিন* ৩০.০৩.২০১২ পৃ.।

৪১. জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঋতু শেষের বিষণ্ণতা', *আনন্দবাজার পত্রিকা* (পত্রিকা), ১১.০৯.২০১৩, পৃ. ৯-১০।

৪২. Interview of Dibakar Bandyopadhyay and Sushant Sing Rajput, *The Telegraph* (t_2), 25.07.2013, p. 10.

৪৩. শান্তনু চক্রবর্তী, 'ব্যোমকেশ ম্যানিয়া', *আনন্দবাজার পত্রিকা* (রবিবাসরীয়), ১২.০৪.২০১৫, পৃ.৯।

৪৪. Interview of Anjan Dutt, *The Telegraph* (t_2) 17.08.2010.p7.

৪৫. কাঞ্চন বসু, 'মঞ্চে ব্যোমকেশ' *বাংলা ও বাঙালি* (সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা), ১৩.০৭.২০১২।

৪৬. আনন্দবাজার পত্রিকা, ০২.১০.১৯৮০, পৃ.২।

৪৭. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২০১১.১৯৬৪, প. ৬।

৪৮. অরিন্দম শীল বলেছেন, ''ব্যোমকেশ চশমা পরেন না। কিন্তু বাঙালি মানসিকতায় ঢুকে গিয়েছে ব্যোমকেশের চশমা রয়েছে। তাই ব্যোমকেশ-এর বুদ্ধিদীপ্ত চোখদুটো হাইলাইট

করতে চাই বলে, এমন চশমার ফ্রেম নির্বাচন করা হয়েছে, যাতে চোখ দুটো বেরিয়ে আসে। *এই সময়* (অন্যসময়), ১৮.০৭.২০১৫, পৃ.১।

৪৯. অরিন্দম জানাচ্ছেন, "...আমার এই ছবির ইন্সপিরেশন যদি আমি কোথাও পেয়ে থাকি তাহলে সেটা একমাত্র সত্যজিৎ রায়। তাঁর 'চিড়িয়াখানা' আমার মতে বাংলা চলচ্চিত্রের একমাত্র সেরা ব্যোমকেশ। তাই তাঁকে সম্মান জানানোর জন্য...আমি ঠিক করলাম যে বেনারসে আমি এই ছবির শুটিং করব।" (*খবর ৩৬৫ দিন*, ২৫.০৮.২০১৫, পৃ. ৫)।

৫০. বিমল মিত্র, 'একজন মানুষের মতো মানুষ', *দেশ*, ১৬ আশ্বিন ১৩৭৭, পৃ. ৯৬২।

৫১. সত্যবতী ও ইন্দিরার এই সাদৃশ্যের দিকটি আমাকে খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষ।

৫২. অনিরুদ্ধ ধর, 'খারাপ লাগার ৫$\frac{ত}{ত}$ টি কারণ', *একদিন* (বিনোদন), ২১.০৮.২০১৫, পৃ.১।

৫৩. সম্রাট মুখোপাধ্যায়, 'ব্যোমকেশে শরদিন্দু নেই' *আজকাল* (টেলিভিশন), ১১.০৪.২০১৫ পৃ. ৩।

৫৪. দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার, 'বক্সী বিতর্কে বাঁড়ুজ্জ্যে Take' *এই সময়* (অন্যসময়), ০৮. ০৪.২০১৫, পৃ.১।

৫৫. দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায়, "'বরফি' 'কহানি'র দর্শক আমার ব্যোমকেশ দেখুন, তাই বাঙালি অভিনেতা খুঁজিনি, বেছেছি সুশান্তকে", *খবর* ৩৬৫ দিন(বিবি), ২৬.০৭.২০১৩, পৃ. ৬

৫৬. Paul Newall, 'Postmodernism 12.06.2005, (www.galiban-library.org)

৫৭. *The Telegraph* (t_2) 17.08.2010 p. 7.

৫৮. Umberto Eco, *Interpretation and Overinterpretation,* 1992 : Cambridge, Cambridge University Press p. 24.